'রক্তকরবী'র

তত্ত্ব ও তাৎপর্য

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বঙ্গবাসী কলেজ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু,
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ,
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক ঃ
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

সুহৃদ্বরেষু

লেখকের অন্যান্য পুস্তক :

যুগসন্ধি (মাইকেলের জীবনী অবলম্বনে পঞ্চাঙ্ক নাটক)

মাইকেল জীবনীর আদিপর্ব (যন্ত্রস্থ)

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের মানসিক গ্রহণশীলতার ইয়ত্তা নেই। তাঁর মন যা-কিছুর সংস্পর্শে এসেছে, তা-ই আত্মসাৎ করেছে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বস্তুবাদ পর্যন্ত কিছুই তিনি বাদ দেন নি। মাইকেল শুধু আঙ্গিক অপহরণ করেছেন ; রবীন্দ্রনাথ সারা দুনিয়ার ভাবৈশ্বর্য লুঠ করে এনেছেন। তাঁর এই স্বকীয়করণ-বৃত্তির দুটি পর্যায় আছে। জীবনের প্রথম দিকে এই বৃত্তি মহর্ষির প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তাতে আধ্যাত্মিক ঝোঁকই ছিল প্রবল। এই পর্যায়ের শেষ হয়েছিল 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি' ও 'রাজা'য়। শেষের দিকে তাঁর মন ক্রমশঃ বাস্তবাভিমুখী হয়ে পড়ে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে অংশ গ্রহণে এর সূচনা, পাশ্চাত্য জীবন ও ভাবধারার সহিত পরিচয়ে এর পরিণতি।

কবি-জীবনের কেন্দ্র-সত্যের নির্ভুল অবধারণা ব্যতীত কাব্য-বিচার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আমি মনে করি 'রক্তকরবী' নাটকটি উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ ও সার্থকতম নিদর্শন। এ যাবৎ এই নাটকটির আলোচনার ধারা তাঁর অন্যান্য রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের রীতি অনুবর্তন করেছে। এই বিচার মূলতঃ ভাববাদী হওয়াতে সমালোচকের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হয়েছে, এবং এর বাস্তবানুগ আবেদন মোটের উপর অগ্রাহ্য হয়েছে। আমি নাটকটিকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেছি। আধ্যাত্মিক ভাব-বাতিকের চেয়ে একটা বস্তু-সচেতন জীবন-সংবিৎ যে এর কেন্দ্রে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে আমার কোনও সংশয় নেই। পাঠকের মনে এই নিঃসংশয়তা সঞ্চার করতে পেরেছি কি-না তার বিচার সত্য নির্ধারণের পথ প্রশস্ত করে দেবে। সেই-টুকুই লাভ।

আসল কথা সত্য নির্ধারণের প্রয়োজনেই তর্কের সূচনা, সত্যের অনুশীলনেই তর্কের সার্থকতা, এবং একমাত্র সত্যের মীমাংসাতেই তর্কের অবসান হতে পারে।

এই আলোচনায় বন্ধুবর নীরেন্দ্রনাথ রায়ের যুক্তিবাদী মননশীলতা আমাকে প্রবৃত্ত করে, এবং তাঁর দিক থেকে একটা প্রচ্ছন্ন তাগিদ না থাকলে হয়-ত আমার দীর্ঘসূত্রিতা দীর্ঘতর হত।

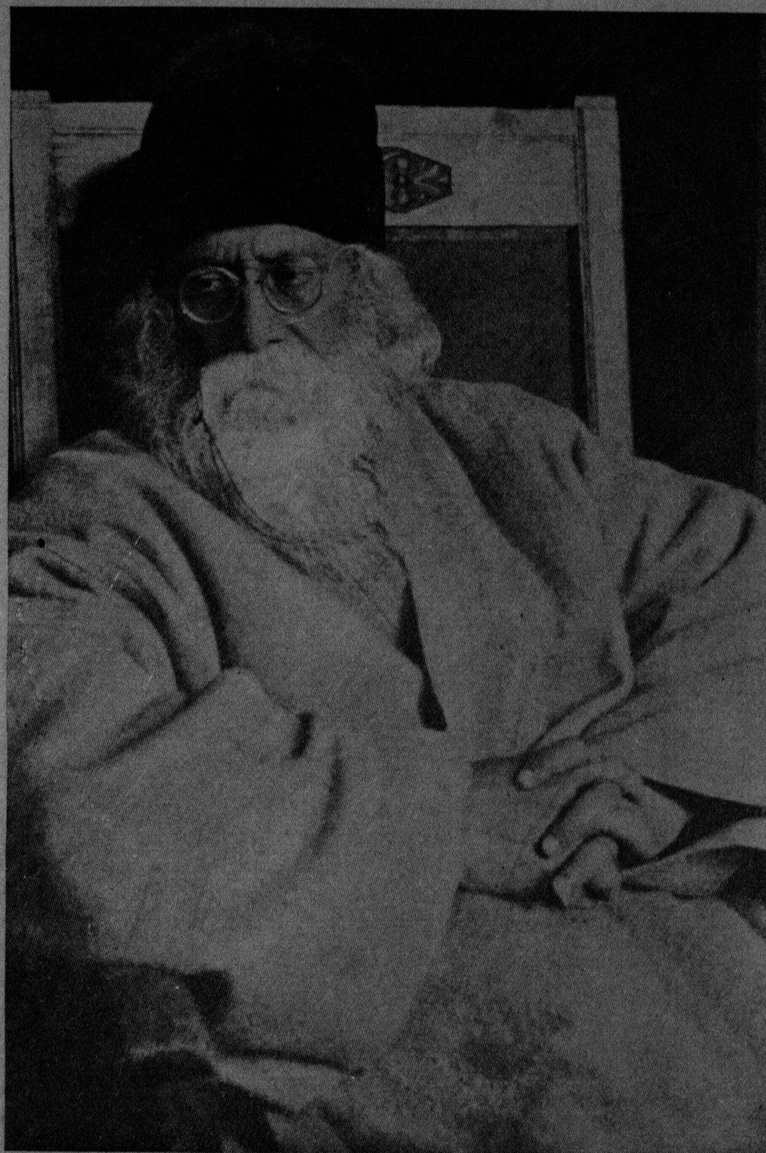
এই প্রসঙ্গে আর যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও বিচার করেছি তাঁদের মধ্যে প্রীতিভাজন ডক্টর সীতাংশু মৈত্র, ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুলিপি পড়ে ও নানাপ্রকার মন্তব্য করে আমার কাজে সহায়তা করেছেন, এটুকু উল্লেখ না-করলে অন্যায় হবে। এ ছাড়া আমি নাটকটি সম্বন্ধে যে-সব সমালোচনা পড়েছি, তার সংখ্যা কম নয়, এবং তাদের প্রভাব আমার যুক্তিধারাকে পরিচালিত করেছে নিশ্চয়। তবে যুক্তি-বিন্যাস ও সিদ্ধান্তের সমস্ত দায়িত্ব অবশ্য আমার।

কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে বলে হয়-ত মাঝে মাঝে অনাবশ্যক পুনরুল্লেখ ঘটেছে। আশা করি, তাতে যুক্তির সরল ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় নি।

১৮।১।৫৯
১৩।১, রিচি রোড
কলিকাতা-১৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সূচীপত্র



'রক্তকরবী'র কবি

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

(১)

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে 'রক্তকরবী'র স্থান অনেকটা 'হ্যামলেট'-এর মতন। নাটকটির সম্বন্ধে তর্কের শেষ নেই, মতান্তরের অবধি নেই। এ সম্ভাবনা বোধ হয় কবি অনুমান করেছিলেন ঃ তাই নাটকের 'প্রস্তাবনা'য় সমালোচকদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তারা পালাটিকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।" এতে নাটকের গূঢ় অর্থের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, অথচ দুর্জ্ঞেয়তার আবরণে কবি নাটকে যা বলতে চেয়েছেন তা শুধু বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। এই জন্যই অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ এর তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে অনবরত আলোচনা চলেছে; চারু বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত আলোচনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে। এ আলাপে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু ঐকতান নেই। বোধ হয় এই প্রকার পরিণতি আশঙ্কা করে কবি নিবেদন করেছিলেন, "যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ করলেই তার সার্থকতা চলে যায়।" অতএব "গোপনে যে অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি" না করাই সমীচীন, এমনও একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

কিন্তু কোনও বিশ্ববরেণ্য কবির পক্ষে সমালোচকদের এ-ভাবে নিরস্ত করা সম্ভব নয়, কারণ বাক্য ও অর্থ পার্বতী-পরমেশ্বরের মতই সম্পৃক্ত ঃ একটিকে ধ্যান করলে অপরটির আরাধনা না করে উপায় নেই। কবির দায়িত্ব সৃষ্টি করা; সমালোচক তাকে নানাদিক্ থেকে পর্যবেক্ষণ করে তার অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করবেন, আবহমান কাল

থেকে সাহিত্যের আসরে এ রীতি চলে আসছে। তাৎপর্য যত গভীর কিংবা সুদূরপ্রসারী, তার আলোচনাও স্বভাবতঃ তত বহুমুখী হতে বাধ্য। বাস্তবিক, মতান্তরের বৈচিত্র্য রচনার মর্যাদারই পরিচায়ক। 'রক্তকরবী' সম্বন্ধে আজ বহুদিন যাবৎ আমিও একটি মত পোষণ করে আসছি; তার তাৎপর্য প্রচলিত আলোচনার রীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন। সেই মতের প্রতিপাদন এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। এই মতটি একান্তই বাস্তবধর্মী; আমি নাটকের ভাষার সরল অর্থ অনুসরণ করে ভাবের অন্তরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছি; নাটকটিকে তার বাস্তব পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে তার তাৎপর্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছি। সংস্কারাশ্রিত ভাববাদের কুহেলিকা যাতে ভাষার স্পষ্ট ইঙ্গিতকে আচ্ছন্ন বা দিক্‌ভ্রষ্ট না করে সে দিকে সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করেছি। এতে বিজ্ঞ ও তত্ত্ববিলাসী পাঠক হয়ত অতৃপ্তি বোধ করবেন। আমার একমাত্র ভরসা নিরপেক্ষ বিচারে নাটকটিকে যে বাস্তব পরিবেশে বিশ্লেষণ করেছি তা মোটামুটি স্বীকৃত হলে, তা থেকে অনুসৃত সিদ্ধান্তগুলি সরাসরি অগ্রাহ্য হবে না।

(২)

নাটকমাত্রের সার্থকতা অভিনয়ে। আর অভিনয় তখনই সার্থক হয় যখন তা নাটকের কেন্দ্রসত্যকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। আমাদের দুর্ভাগ্য কবির জীবিতকালে নাটকটির অভিনয় হয়নি: এর কারণ সম্পর্কে স্থানান্তরে আলোচনা করেছি। কিন্তু এই অনভিনয়ের ফলে, অর্থাৎ কবির নির্দেশানুসারে অভিনয় হয়নি বলে, কবির অভিপ্রায় শেষ পর্যন্ত অস্পষ্ট রয়ে গেল, এবং এর প্রকৃত কেন্দ্রসত্যের সঠিক উপলব্ধির সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। এ সুযোগ পেলে হয়-ত আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হত, বিভ্রান্তিরও অবসান হত। সম্প্রতিকালে কিছুটা এ সুযোগ আমাদের দিয়েছেন 'বহুরূপী' নাট্য

সম্প্রদায়। নাটকটি সাফল্যের সহিত বারবার মঞ্চস্থ করে এঁরা কৃতিত্ব ও সুনাম অর্জন করেছেন, এবং এর নাটকীয়তা প্রতিপন্ন করেছেন। এই অভিনয় দেখবার পর আমার নিজের ধারণার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি আরও নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছি। পরে এঁদের পত্রিকায় নাটকটি সম্বন্ধে শ্রীশম্ভু মিত্রের আলোচনা পড়েছি। তাঁর মতের সঙ্গে আমার কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও আমি মনে করি আমার অনুশীলন 'বহুরূপী'র অভিনয়ের পরিচায়ক ও পরিপূরক। তাঁরা অন্ততঃ এ দাবী করতে পারেন যে, তাঁরাই নাটকটিকে তত্ত্ববিশারদের হাত থেকে উদ্ধার করে প্রমাণ করেছেন 'রক্তকরবী' হেঁয়ালী নয়,—নাটক।

(৩)

সাধারণতঃ নাটকটিকে অন্য মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা হয়। অর্থাৎ একে রূপক নাট্যের পর্যায়ভুক্ত করে ঐ নাট্যের রীতি অনুসারে বিচার ও ব্যাখ্যা করা হয়। আমার মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত এবং সর্বপ্রকার বিভ্রান্তির আকর। রূপক নাট্যে বাস্তব সত্যের উপর ভাবের গাঢ় রং ও রেখা আরোপিত হয়। এই আরোপণের রীতি কাব্যধর্মী। নাটকের বিচারে এই রীতিকে প্রাধান্য দিলে কাব্যধর্মিতার অনুশাসনে নাটকের বাস্তব আবেদন অবহেলিত ও অগ্রাহ্য হয়। কাব্য ভাবাশ্রয়ী; কবি-মানসে বাস্তব প্রতিফলিত হয়ে ভাববাসিত হয়। ফলে, নাটকটি তার অনুকল্পিত বাস্তব পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মমুখী ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়। সে আলোচনা যতই কবিত্বপূর্ণ হোক, আসলে দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। অথচ 'রক্তকরবী'র কাহিনী ও চরিত্রে যে বাস্তব জীবনের আলেখ্য বিচিত্রিত, তাকে উপেক্ষা করব কেমন করে? বস্তুতঃ জীবনের ভাবনিরপেক্ষ সত্তাই নাটকের প্রাণবস্তু, যা থেকে ঘটনা ও চরিত্র বিস্তার লাভ করে। একথা স্বীকার করলে 'রক্তকরবী' মূলতঃ একটি বাস্তবধর্মী

জীবনালেখ্য এ ধারণার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি হতে পারে না। যদি-ই বা এর ঘটনাংশে কিছুটা দুর্বলতা থাকে, এর চরিত্রসত্তার বাস্তব জীবনের চমৎকারিত্বে সমৃদ্ধ। এর সংলাপ, ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, রাগ-অনুরাগ প্রভৃতি বিচিত্র আবেগের অজস্র স্ফুলিঙ্গে বিচ্ছুরিত। কখনও কল্পনার আকাশ-ছোঁয়া রঙে রঙীন; কখনও অনুভবের অনুরাগস্পর্শে স্নিগ্ধ; কখনও বা উদ্দীপ্ত ক্রোধের ঔদ্ধত্যে ভ্রূকুটি-কুটিল:— কোথাও অস্পষ্টতার আভাস মাত্র নেই। তাই অভিনয় দর্শনের পর সন্দেহ থাকে না যে, এই চরিত্রগুলি আমাদেরই সুপরিচিত বাস্তবজগতের মানুষ; এরা কোনও স্বপ্নলোকের বাসিন্দা নয়। এদের জীবনে রংও আছে, রাগও আছে; যেমন আকাঙ্ক্ষা আছে, তেমনি আশঙ্কাও আছে। তাই এদের ভাবজগতের ছায়ামূর্তিতে পরিণত করলে, নাটকের অপমৃত্যু ঘটবে, নাট্যকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আসল কথা, ভাষার সরল অর্থ যেখানে সুস্পষ্ট, সেখানে কল্পনার তির্যক্ গতিরেখার অনুবর্তন একপ্রকার মানসিক বিলাস মাত্র; আসর জমানোর পক্ষে উপাদেয়, কিন্তু সার্থকতার প্রয়োজনে নিতান্তই বাহুল্য।

(৪)

কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটক হলেও, শেক্‌সপীরীয় বা শেহ্বীয় নাটকের অনুকল্প নয়। শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকে প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব ব্যক্তি-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত; তাদের চিরন্তন মানবসত্তার পশ্চাতে তারা একান্তভাবে বিশেষ কালের মানুষ, বিশেষ সমাজের প্রতিনিধি। শ'-এর চরিত্রগুলি একান্ত এবং অভ্রান্তভাবে তাঁরই মানসপুত্র; অনুগত সেবকের মত তাদের স্রষ্টার মতামত জাহির করাই তাদের ধর্ম। 'রক্ত-করবী'-কে এই শ্রেণীর নাটকের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না, কারণ নাটকের মানুষগুলি যদিও বাস্তব জগতেরই বটে, কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অথবা

বিশিষ্ট মতের সীমাবন্ধন অতিক্রম করে তাদের চাল-চলন কথাবর্তায় শ্রেণীগত বা বৃত্তিগত সংকেতের ইসারা নাটকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তারা একদিকে যেমন ব্যক্তি; অন্যদিকে তেমনি তারা প্রতীকী। তাদের প্রতীকীসত্তা ও বাস্তবসত্তা পরস্পরকে মানবিকও সামাজিক তাৎপর্যের দিক্ থেকে সমৃদ্ধ করছে। অবশ্য শেক্স্পীয়র-এর নাট্যচরিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিশ্চয় বিশ্লেষণে ধরা পড়ে, কিন্তু এ দিক্‌টা অপ্রধান; জীবনের বাঁধা-ধরা ছকে এর গুরুত্ব অল্প; চরিত্রের প্রতীকী-তাৎপর্য বাস্তব সত্যকে পূর্ণতর করতে সাহায্য করে মাত্র। শেভীয় নাটকের সংলাপাংশে প্রত্যেকটি চরিত্রের সাংকেতিক তাৎপর্য অনেক সময়ে অসহনীয়ভাবে প্রকট; চরিত্রের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য মতপ্রকাশের প্রগল্‌ভতায় প্রচ্ছন্ন। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত রূপক-নাট্যে—অর্থাৎ 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'ঋণশোধ' প্রভৃতিতে—চরিত্রের সমাজ-বাস্তবতা রূপকের ব্যঞ্জনায় অভিভূত। এখানে কাব্যানুভূতিই নাটকে গতি সঞ্চার করে; যে স্বপ্নলোকের মায়া এদের কল্পজগতে দিক্‌চক্রবালের মত দিগন্তে ঝিলমিল করে, তা আমাদের সম্যক অবধারণার বাইরে, সহজে নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু 'মুক্তধারা'র ও বিশেষ করে 'রক্তকরবী'-র প্রতীকী আবেদন বাস্তবের ওপর নির্ভরশীল; বাস্তবকে অবধারণ করলেই তার ব্যঞ্জনা অধিগম্য হয়। এদের প্রত্যেকটি চরিত্রে এবং ঘটনায় বাস্তবরূপের সঙ্গে সাংকেতিক ইঙ্গিতের সংমিশ্রণ বিশেষ ভাবে অর্থপূর্ণ। একদিকে সংসারের পরিচিত রঙ্গমঞ্চে এদের মানবিক সংলাপ ও সংশ্লেষ আমাদের মনে আবেগ সঞ্চার ও রস সৃষ্টি করে; অপরদিকে এদের হাবভাব ও আলাপ-আলোচনা একটা অনববারণীয় আসন্নতার আভাস দেয়। এই ধরণের নাটকে সমকালীন বাস্তবতা ও ভাবীকালের 'সম্ভাবনা অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। ব্যক্তি হিসাবে এরা কালের সীমাবন্ধনে বন্দী, অথচ এরা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয় এরা আগামী কালের অগ্রদূত।

(৫)

আমার মনে হয় আসলে নাটকটিতে প্রচলিত নাট্যরীতির স্থান-কাল-পাত্রের পরিমিত সীমায় একটা গতিবেগের দ্রুতি প্রযুক্ত হওয়ায় কিছুটা চতুর্মানীয় ভাব (four-dimensional effcet) সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই রীতির ব্যবহার নূতন নয়। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে (যথা, 'প্রকৃতির পরিশোধ'-এ) তিনি এই রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন, যদিও তখন এর তাৎপর্য জীবনানুভূতির গভীরতর স্তরে পৌঁছায়নি। এই রীতিতে স্থান-কাল-পাত্রের প্রত্যক্ষ ঘটনায় ভাবীকালের ইঙ্গিত একটা আপেক্ষিক গতিবেগের অনুভব সৃষ্টি করে। ঘটনার পশ্চাতে আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে অতিক্রম করে রয়েছে সমাজ-বিবর্তনের সূচনা। এই রীতিতে যাকে নাটকীয় ঔৎসুক্য বলা হয়, তা অনুপস্থিত হলেও সর্বক্ষণ এ একটা মানসিক উৎকর্ণতা সৃষ্টি করে যা প্রতীয়মান জগৎকে ছাড়িয়ে ভাবীকালের প্রতীক্ষায় আমাদের উন্মুখ করে রাখে। ঔৎসুক্য শুধু চরিত্রে বিধৃত ; উন্মুখতার ইঙ্গিত দিগন্ত-প্রসারিত। নাটকের গঠনপ্রণালী এই প্রয়োজনে গাঢ় সন্নিবদ্ধ অথচ দ্রুত সঞ্চারিত। গ্রীক নাটকের সংহতির সঙ্গে আমাদের লোকনাট্যের কোলাহলমুখর চঞ্চলতার সংমিশ্রণে এই রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। জালের আবরণে প্রচ্ছন্ন 'রাজা'র নিশ্চল অবস্থিতিতে গ্রীক্-নাটকের সংহত পরিবেশ অবধৃত। এই অবস্থিতির পটভূমিকায় অন্যান্য চরিত্রের অবিরাম আনাগোনা জীবনের দ্রুত গতিবেগের পরিচায়ক। পাশ্চাত্য দেশে এই ধরনের নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিস্তর চলেছে : বহির্জগতের সংগে অন্তর্জগতের বিরোধিতা যে বিপর্যয় ঘটায় তার অভিব্যঞ্জনায় আধুনিক রঙ্গমঞ্চে নানাবিধ সরঞ্জাম দর্শনীয়ভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এতে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয়, যা অভিনবত্বের চমৎকারিত্বে দর্শকদের বিমোহিত ও উৎকর্ণ করে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাট্যপ্রযোজনায় সরল ও স্বাভাবিক উপকরণে বিশ্বাসবান; তিনি নাটকে অনাবশ্যক আড়ম্বর ব্যতীত এই বিরোধ কালের গতিশীলতার পটভূমিকায় অভিব্যক্ত করেছেন। দু'একটি প্রত্যক্ষ প্রতীক ব্যতীত তিনি অন্য কোনও সরঞ্জাম আমদানি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন। এর বদলে তিনি নির্ভর করেছেন প্রতীকী চরিত্রের প্রাণবন্ত ব্যঞ্জনার উপর। সেইজন্য তাঁর নাটক প্রাচীন গ্রীক নাটক ও আমাদের লোকনাট্যের প্রযোজনরীতি স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও তার বিষয়বস্তু ও আবেদন অত্যন্ত আধুনিক। এই দিক দিয়ে 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'-র রচনা-শৈলীর আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৬)

'রক্তকরবী'-র ভাবসত্যকে আমি শ্রেণীদ্বন্দ্বের পটভূমিকায় বিচার করেছি। আধুনিককালে এই দ্বন্দ্ব সমাজের বহিরাঙ্গ ও মানসপ্রকৃতি উভয়কে অধিকার করে রয়েছে; আমাদের চেতনা এই মৌলিক দ্বন্দ্বের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। স্বীকার করি বা না-ই করি, কি চিন্তায়, কি কর্মে আমরা আমাদের শ্রেণীর পরিবৃত্তি লঙ্ঘন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। রবীন্দ্রনাথ 'শ্রেণী' শব্দটির ব্যবহারে কিছুটা সংকোচ বোধ করেছেন,—বোধ হয় শব্দটির সাম্যবাদী বিপ্লবাত্মক অভিব্যঞ্জনা স্মরণ করে। সে-যুগে সাম্যবাদের কর্মপন্থা অনেকের মনেই অগ্রহণীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথও এই মতবাদকে কখনও আমল দেননি। এ সত্ত্বেও কবি যে শব্দটি ব্যবহার না করেও পারেন নি, এটা তাঁর সত্যনিষ্ঠ ও সত্যসন্ধানী মনের পরিচায়ক। অবশ্য ভবিষ্যৎ সমাজের বৈপ্লবিক পরিণতি যে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অনিবার্য করতে পারে, এ সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক রচনায় আভাসে ইঙ্গিতে স্বীকার করেছেন। মহৎ কবির মানসপটে আগামীকালের আভাস এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে; তাই-ত তিনি ক্রান্তদর্শী। আজ 'রক্তকরবী' রচনার পর

এক যুগ কেটে গেছে। সেদিন যবনিকার অন্তরালে যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তা আমাদের চোখের সামনে অবারিত। যে শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা গান্ধীজীকে আতঙ্কিত করেছিল, যা রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত দ্বিধান্বিত করেছিল, আজ তা আমাদের দ্বারপ্রান্তে সমাগত। ফলে, আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা পূর্বসংস্কারকে পরিবর্তন বা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। তাই আমরা সেদিনের দ্বিধা সংকোচ অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ আমাদের মানসপটে আজ উদ্‌ঘাটিত। অতএব একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে আমি নাটকটির বিচার করেছি বলেই সে বিচার অগ্রহণীয় হবে, আজ এ আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।

আজ রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী মহা উৎসাহে দেশ বিদেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই উৎসব আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে কবি কালের গণ্ডী পার হয়ে গিয়েছেন, অতীতের দ্রুত অপস্রিয়মান পরিপ্রেক্ষণিকায় তাঁর প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হতে চলেছে। কবি সম্পর্কে আমাদের মোহের গাঢ়তা অনেক পরিমাণে ফিকে হয়ে এসেছে; তাঁকে অসম্পৃক্ত মনে বিচার করবার পথে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছি। দেখছি গোষ্ঠী ও গণ্ডীর সীমা ছাড়িয়ে, সর্বপ্রকার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে, ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে তাঁর গৌরব দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর কাব্যের ঘনিষ্ঠ ও নিগূঢ় সম্পর্ক, তাঁর অনন্যসাধারণ কবি-মানসের উপর অতি সাধারণ বাস্তব পরিবেশের প্রভাব, কোনখানে তিনি যুগধর্মকে স্বীকার করেছেন, কোথায় তাকে অতিক্রম করেছেন, এবং কতটা তিনি পূর্বসংস্কার ও ঐতিহ্যের নাগপাশ ছিন্ন করে বস্তুচেতনায় নবজন্ম লাভ করেছেন,—এই সব প্রশ্নের সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত বিচার আমাদের সাহিত্যবোধকে নানাদিকে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করবে নিশ্চয়। কিন্তু এই দুরূহ সাধনার জন্য আবশ্যক বারেবারে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, সত্যনিষ্ঠ মনের কষ্টিপাথরে সব রকম মতামতের বিচার, এবং ভাববিমুক্ত

মনে কেন্দ্রসত্য উপলব্ধি করা। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিপুত্র, এটা তাঁর সত্য পরিচয় হলেও শেষ বা একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি মানবপুত্র। আগামী কালে এইটাই হবে তাঁর গৌরব। কারণ ঋষির সাধনা দিতে পারে অমৃত, কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধা দেয় অমরত্ব। কবি অমৃতের নয়, এই অমরত্বের অধিকারী। 'রক্তকরবী'র প্রত্যেকটি পংক্তি এই সত্য পরিচয়ে স্বাক্ষরিত।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পটভূমিকা বিচার

(১)

'রক্তকরবী' সম্বন্ধে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'তে বলেছেন :

> "শিলঙে যে নাটকটি রচনা করেন (১৩৩০) তার প্রথমে নাম দেন 'যক্ষপুরী'; পরে দেন 'রক্তকরবী'। বইখানি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় অনেক কাটছাঁটার পর ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে। ...শিলঙ হইতে ফিরিয়া কবি দুদিন নাটকটিকে পড়িয়া শোনান। কবি নিজের লেখার উপর এখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আমরা জানি বহুবার উহাকে কাটাছাঁটা করেন এবং ছাপাইতেও অবিলম্বে দিলেন না" (রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড)।

দেখা যায় লেখার তিন বৎসর পরে নাটকটি প্রকাশিত হয় পুস্তকাকারে ১৩৩৩ সালে।

কি ধরণের কাটছাঁটা করেছিলেন তার হদিস পেলে আমাদের আলোচনার পক্ষে অনেক জরুরী তথ্য নিশ্চয় পাওয়া যেত। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রকাশিত সংস্করণগুলির তুলনামূলক বিচার ব্যতীত কোনও রচনার চূড়ান্তভাবে মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে আপাততঃ কবি আমাদের যতটুকু জানতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেছেন, তাই আমাদের অবলম্বন।

রচনা এবং প্রকাশনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করে প্রভাতবাবু ঠিকই সিদ্ধান্ত করেছেন, যে-কোনও কারণেই হোক কবি "নিজের লেখার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই"। অর্থাৎ নাটকটি লিখে কবি যথেষ্ট পরিমাণে বিব্রত হয়েছিলেন। মনে হয় নাটকটিতে

অভিব্যক্ত সব কিছুকে তাঁর সচেতন মন অনুমোদন করেন নি ; মনের আনাচে-কানাচে কোথায় যেন একটা খটকা থেকে গেছে। এইটা মনে রাখলে প্রথম পাণ্ডুলিপির এবং পরবর্তী কালের সংশোধনের তালিকার অভাবসত্ত্বেও, কবির অসন্তোষের কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। নাটকের মানসিক পটভূমিকায় ও যুগ-পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে দেখলে বোঝা যায় নাটকটিতে কবির পূর্ব সংস্কার বা আদর্শের সহিত মৌলিক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কারের মূল যত গভীর, তাকে অস্বীকার করা তত বেদনাযুক্ত। অতএব আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে পটভূমিকা বিচার করা একান্ত প্রয়োজন।

আঁমরা জানি প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কবির দৃষ্টি মোটামুটিভাবে স্বদেশী সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যা তিনি কত বিস্তারিত ও গভীরভাবে চিন্তা করতেন তার পরিচয় তাঁর রচনাবলীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বস্তুতপক্ষে আমাদের জাতীয় জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও তাদের সমাধান সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত কার্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার না করলেও অনেকের মনে চিন্তার খোরাক জুগিয়ে ছিল। এ চিন্তা ফলপ্রসূ হয়নি, তার প্রধান কারণ তখনও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী অবাস্তব ছিল। শত্রুপক্ষের দুর্বলতায় আঘাত করা অপেক্ষা আত্মবলে বলীয়ান হবার সাধনা তিনি কামনা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন বিদেশী শাসককে উপেক্ষা করে একটা বলিষ্ঠ গ্রামীণ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। সম্ভবতঃ যখন দেখলেন বিনা কারণে শান্তিনিকেতন ও পরে শ্রীনিকেতনের উপর কর্তৃপক্ষের গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টি দিনে দিনে প্রখর হয়ে উঠছে, এবং এর ফলে নানাবিধ অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে, তখন থেকে তাঁর একটা মানসিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সদিচ্ছা থাকলেও সৎকর্মে আত্মনিয়োগ ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে সহজ নয়, এ কথা তিনি

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর নিজের এলাকার বাহিরেও, বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে, দেখলেন বিদেশী শাসকদের নিপীড়ন যন্ত্র ক্রমেই নিষ্করুণ হয়ে উঠছে ; আরও দেখলেন এই নিষ্পেষণী যন্ত্রের পরিচালনা করছেন কতকগুলি স্বদেশবাসী টাকা ও মর্যাদার লোভে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ; নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে মর্মান্তিক ভ্রান্তি। পরে প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় অনগ্রসর উপনিবেশের শোষণে পাশ্চাত্য জাতিগুলির ক্রমবর্ধমান উৎসাহ তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই ১৯১৪ সালের পর থেকে তাঁর অনেক রচনায় ও ভাষণে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব দেখতে পাই, যাতে আছে মানব জাতি সম্বন্ধে তীব্র বেদনাবোধ, অন্যায়ের প্রতিবাদে উগ্র স্পষ্টবাদিতা, ও সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় নির্ভীক সত্যভাষণ। এই মনোভাবের চরম অভিব্যক্তি হয়েছিল আমেরিকা ও জাপানে প্রদত্ত 'ন্যাশানালিজম্' সম্পর্কে বক্তৃতায়, যার উপলক্ষ্য দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শোষণধর্মী রাষ্ট্রনীতি। নামকরণে রাষ্ট্রতত্ত্বের পরিভাষা ব্যবহার হয়-ত শাস্ত্রসম্মত হয়নি ; অন্ততঃ আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের চরম মুহূর্তে কবি 'জাতীয়তাবাদ'কে আক্রমণ করেছেন, রয়টার-এর এ সংবাদ তখনকার সেইসব নেতাকে ক্ষুব্ধ করেছিল যাঁরা বিদেশী সংবাদ-সংস্থা পরিবেশিত খণ্ডিত বিবরণ থেকে তথ্য আহরণ করতেন। কারণ এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য যে জাতীয়তাবাদ নয়, আসল লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদে পরিণত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, যারা সাজাত্য-অহমিকার উগ্র মদিরা পান করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এ কথা ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান এরা বুঝেছিল, এবং বুঝেছিল বলেই এই সব দেশে কবির খ্যাতি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। আজও তাঁর প্রতিভা সাম্যবাদী দেশগুলিতে যতটা স্বীকৃত হয়েছে, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ততটা হয় নি।

(২)

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ কিভাবে তাদের মানবিক বৃত্তিগুলিকে জলাঞ্জলি দেয়, পরস্বাপহরণে নির্লজ্জভাবে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, তার পরিচয় কবি নিজের দেশে ইংরাজদের আচরণের মধ্যে পেয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের এই চরম অবনতি তাঁকে কতদূর ব্যথিত করেছিল তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বারবার প্রকাশ করেছেন বহুদিন পরে :

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ-বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

[প্রশ্ন : ১৩৩৮]

কবিতাটির শেষ স্তবক যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় শেষ হয়েছে,—"তুমি কি তাদের করিয়াছ ক্ষমা, তুমি কি বেসেছ ভাল ?"—তাতে কবির মনে পরম কারুণিকের নির্বিশেষ করুণা সম্বন্ধে যে সংশয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে তার উৎপত্তি এইসব মর্মান্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতায়। অপর পক্ষে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অশক্তের নিষ্ফল ক্রন্দন তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে, ক্রুদ্ধ করেছে ; অমৃতসরে জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বড়লাটকে লিখিত পত্রে তা ব্যক্ত করেছেন : অসহায়ের নিপীড়নে শক্তিশালীর বলপ্রয়োগ যে কাপুরুষতা, তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু এই অত্যাচারের মূল কোথায়, কোন সমাজ-ব্যবস্থায় এ জাতীয় ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের স্পষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায় না। এর কারণ অর্থনৈতিক কারণ অপেক্ষা নৈতিক কারণের উপর বেশী জোর দেওয়ার ফলে তাঁর বিশ্লেষণ বিজ্ঞান-সম্মত হতে পারে নি। এ-বিষয়ে তাঁর ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীই আসলে দায়ী।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতন মননশীল কবি এই বিশ্বসমস্যার মানবিক দিকটা যেমন অনুধাবন করেছেন, তেমনি এর প্রতিকারের চিন্তা থেকে বিরত হন নি। প্রথম দিকে তাঁর এই চিন্তা তাঁর আজন্ম ভাববাদী সংস্কারের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো কোনও সম্ভাব্য সমাধানকে আশ্রয় করেছিল। ঈশ্বর আমাদের পরম রতি ও পরম গতি এই মূল সূত্রকে স্বীকার করে তিনি আস্তিক্যবাদী মীমাংসাকেই মেনে নিয়েছিলেন। বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের দ্বারাই আচ্ছন্ন এই বিশ্বাসের মধ্যে সমস্ত সমাধানের যাদুমন্ত্র নিহিত, এই ছিল তাঁর ধারণা। তাই ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে 'বলাকা'-তে বলেছেন :

প্রেমিক আমার,
তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার।
লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে ;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি—
খড়্গ ধর, প্রেমিক আমার,
করগো বিচার।
তারপর দেখি
এ কী!
কোথা তব বিচার আগার ?
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা 'পরে ;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহ শেল ক্ষত-বক্ষে করি লয় গ্রাস। [বলাকা ১১ : ১৩২১]

অর্থাৎ অন্যায়কারী অন্যায় করে, কিন্তু ভগবান যখন তাকে ক্ষমাও করেন, তাঁর অনুগ্রহে নিশ্চয় একদিন মানুষের শুভবুদ্ধির উন্মেষ হবে, তাঁর এই অন্তরের বিশ্বাসে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত সান্ত্বনা পেয়েছেন। কবির সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার আসুরিকতাকে তীব্র ভাষায় ভৎসনা করেও তিনি স্বপ্ন দেখেছেন:

"নিজের দেবত্ব বিস্মরণের পরে পুনরায় মানুষের মনে পড়বে যে, ইহজগৎ চিরকাল স্বর্গের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং তাকে আধুনিক যুগের মানব-রক্ত-গন্ধে উন্মত্ত শিকারী নেকড়ের কাছে চিরদিনের জন্য কখনই উৎসর্গ করা হবে না।"* (অনুবাদ)

এবং পরমশ্রদ্ধাভরে নবযুগের উদ্বোধক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন:

যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ।
সর্বভূতেষু চাত্মানাং ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

(৩)

কিন্তু এ ত সংস্কারের বিশ্বাস, যার পশ্চাতে আছে ঋষি-মহর্ষির মহান ঐতিহ্য ও আশীর্বাণী। এ মন্ত্র উচ্চারণ করে সংস্কারবাদী মন হয়-ত বল পায়, অনুপ্রাণিত হয়; কিন্তু মানুষের যুক্তিবাদী মন চায় যুক্তির সমর্থন,—বিশেষতঃ আধুনিক যুগে। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে শ্রদ্ধা করেছেন। বুদ্ধির বিচারকে তিনি সব সময়েই উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। তাই যুগসংকটে সমাজের অন্তর্বিরোধের সম্মুখীন হয়ে তিনি স্বভাবতঃ সমাধানের সন্ধানে প্রতীচ্য মনীষীদের দ্বারপ্রান্তে হাজির হলেন। তার একটা কারণ, বস্তুবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে প্রতিহত করবার প্রয়োজনে প্রতীচ্যের অনেক চিন্তানায়ক সে দিন ভাববাদ এবং যুক্তিবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের

*"After the forgetfulness of his own divinity man will remember again that heaven is always in touch with the world which can never be abandoned for good to the hounding wolves of the modern era scenting human blood"—*Nationalism*. (1917)

সূত্র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক মহলে মহাকাল ও মহাশূন্য নিয়ে জোর গবেষণা ও আলোচনা চলছিল এই তত্ত্বানুশীলন রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে বের্গসোঁ-র সৃজনশীল বিবর্তনবাদের প্রভাব তিনি অনুভব করেছিলেন সম্ভবতঃ এই কারণে যে ভারতবর্ষের ভাববাদী চিন্তাধারার সঙ্গে এই মতবাদের একটা সঙ্গতি আবিষ্কার করা সহজ। রবীন্দ্রনাথের মতই বের্গসোঁ বস্তুবাদের বিরোধী ছিলেন। অনিবারণীয় কালপ্রবাহ বস্তুজগৎকে সম্ভব করেছে এই ধারণার সঙ্গে এক অমোঘ ঐশী শক্তি পরিবর্তনশীল ঘটনাকে প্রতিমুহূর্তে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে, এই ধারণার মৌলিক সঙ্গতি সুস্পষ্ট। আমরা যাকে মহাকাল বলি সে শুধু ভবিষ্যতের দিকে অতীতের গতিপ্রবাহ,—বর্তমানের ক্ষণিকত্ব তাকে পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করছে মাত্র। কালের এই গতিধর্ম সৃষ্টির মূল কারণ, এবং এই অনন্ত গতিশীলতা দেশ-কাল নিরপেক্ষ সত্তা বস্তুবিবর্তনের তালে তালে আপনার মহিমায় অভিব্যক্ত হচ্ছে। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত সহজেই আসে যে প্রাণধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে কালের গতিবেগ যখন বস্তুজগতের ক্রমবিকাশকে পর্যায়ক্রমে উন্নততর অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, তখন মনোজগতেই বা মানুষের শুভবুদ্ধির ক্রমোন্মেষ সম্ভব হবে না কেন? বের্গসোঁ যাকে 'প্রাণশক্তি' বলেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতার'ই একটি নির্বস্তুক ধারণা। অতএব বর্তমান শুধু এই প্রাণপ্রবাহের ক্ষণিক নিবৃত্তি। সুতরাং কালের সংহত অবস্থিতি মৃত্যুরই সামিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।
[বলাকা ৮ : ১৩২১]

১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'বলাকা' এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার মিলন সংকেত; বের্গসোঁ-র প্রভাবে কবির চিন্তা একটি নূতন গতিপথ নিয়েছে: 'জীবনদেবতা'র আরাধনায় নয়, তার নিয়ন্ত্রিত গতিশীলতার অবধারণায় কবি এখন উচ্ছ্বসিত; জীবনসত্ত্বার অবস্থিতিকে অতিক্রম করছে বিশ্বপ্রবাহের অনন্ত গতি, যে প্রবাহের বেগে জীবনের সব পঙ্কিলতা অপসৃত হয়:

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্যসুন্দরী,
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন॥

[বলাকা ৮ : ১৩২১]

(৪)

অবশ্য এ কথা ঠিক সমাজের রুদ্ধগতি সব দিক থেকে অবাঞ্ছিত, এবং তার অবসান হবে সহসা একদিন—এ বিশ্বাস রবীন্দ্র-সাহিত্যে নূতন নয়। তা ছাড়া মঙ্গলময়ের আবির্ভাব সব সময়ে যে শান্তির পথে আসে না, এ কথাও তাঁর অনেক কাব্যে ও নাটকে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ অনেক সময়ে আসে বিপ্লবের পথে প্রলয়-ঝটিকার দুর্বার গতিবেগে। 'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে এই সুরই একদিন ধ্বনিত হয়েছিল—নূতনের আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানিয়ে:

রথচক্রে ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম
গর্বিত নির্ভয়,
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, না'ই বুঝিলাম,
জয় তব জয়॥

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজপ্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল,
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে,
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে ॥ [১৩০৫]

এই নির্বস্তুক কল্পনাজাত সংস্কারকে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে কবি উপস্থাপিত করলেন 'গান্ধারীর আবেদন'-এ। সমাজে যখন অত্যাচার-অনাচার পুঞ্জীভূত হয় মানুষের বুদ্ধিভ্রংশের ফলে, তখন মহাকাল তার সংশোধনধর্ম উদযাপন করে আপনার নিগূঢ় নিয়মে :

যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ— * * *
* * সেইমত কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।

এই রূপকল্পের পরিণত প্রকাশ 'অচলায়তন'-এ [১৩১৮], একটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ওলট-পালটের মধ্যে দেখতে পাই। যার প্রথম রূপকল্প ঝড়ের গতিবেগে সুচিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে 'বলাকা'য় সেই ভাব নদীর প্রবাহরূপে কল্পিত হয়েছে, কারণ কবি তখনও মঙ্গলময়ের নিগূঢ় বিধানের উপর আস্থাবান। কিন্তু শান্তির পথেই হোক কিংবা বিপর্যয়ের পথেই হোক, এ বিবর্তন ঘটে মহাকালের স্বপ্রবৃত্ত গতিধর্মের এক দুর্জ্ঞেয় নিয়মানুসারে। এর জন্য কোনও প্রকার

মানসিক প্রস্তুতি বা কর্ম-প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। বরং এর আকস্মিক আবির্ভাব অ-প্রস্তুত মানুষকে ত্রস্ত সচকিত করে, সেই মঙ্গলময়ের নিকট আত্মসমর্পণে প্রবৃত্ত করে। যেমন, ঝড়ের রাতে হঠাৎ 'রাজা' এল নিদ্রিত পুরবাসীর মধ্যে; তখন—

কোথায় আলো, কোথায় মালা, কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল, কোথায় সিংহাসন?

*   *   *

বজ্র ডাকে শূন্যতলে বিদ্যুতেরই ঝিলিক মারে।
ছিন্নশয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা;
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখদিনের রাজা।

[খেয়া : ১৩১৬]

নূতনের সহসা আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ ঝড়ের রূপকল্পে পুনরায় প্রকাশ করেছেন পরবর্তী কালে 'তপোভঙ্গ' কবিতায় [১৩৩০]। এখানেও ঐ একই বাণী, শুধু তত্ত্বের দ্যোতনায় আরও গভীর, কল্পনার ইঙ্গিতে আরও সুদূরপ্রসারী, ছন্দের আন্দোলনে আরও উদ্বেল :—

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে;
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে, আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নিশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতাকে স্বীকার করেও কবি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেছেন মহাকালের স্বনিয়ন্ত্রিত গতিবেগই সব কিছুকে একটা কল্যাণকর শান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কালধর্মের একটা স্বাভাবিক লক্ষণ : মানুষের ইচ্ছা বা চেষ্টা এখানে অপ্রয়োজন।

(৫)

এই ধারণা মূলতঃ হেগেল-এর ভাববাদী দর্শনের সমগোত্র। বস্তুর একটা অতিপ্রাকৃত সত্তা আছে যা চিন্তায় অবধার্য হলেও, বস্তুজগতে আমরা তার অধ্যাস মাত্র প্রত্যক্ষ করি। চিন্তার গতিশীলতা, ধারণা থেকে ধারণান্তরে অভিগমন, দ্বান্দ্বিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ প্রত্যেক ধারণা একটা অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে তার বিপরীত ধারণায় পরিণত হয়, এবং এই উভয় ধারণাই পরে একটা পূর্ণতর ধারণায় সমন্বিত হয়। চিন্তার এই দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তি বস্তুজগতে প্রতিফলিত হয়, ইতিহাসের ঘটনা-বিবর্তনের মধ্যে। এই দ্বান্দ্বিক গতিশীলতা মার্কস্‌বাদেও স্বীকৃত। কিন্তু সেখানে এ কোনও নির্গুণ নির্বস্তুক ধারণার উপর নির্ভর করে না। বিশুদ্ধ মননশীলতার নৈয়ায়িক নিয়মে নয়, বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিক নিয়মে এ গতিশীলতা ঘটনাবিবর্তনের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। নিয়মাধীন বলে এ মানুষের বুদ্ধির অধিগম্য; এবং যে-হেতু এ নিয়মকে জানা যায়, একে কার্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব। পরিবর্তন—সে বিবর্তনমূলকই হোক আর বৈপ্লবিকই হোক,—কখনও অকারণে ঘটে না, এবং যে কারণে ঘটে তা নিতান্তই বাস্তব অবস্থা থেকে উদ্ভূত।

রবীন্দ্রনাথ যেমন পরিবর্তনকে স্বীকার করেছেন, তেমনি এই নিয়মকেও তিনি মেনে নিয়েছেন। বলেছেন—

"বিশ্বে একটি বাহিরের দিক আছে, সে দিক সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মের একটু এ-দিক ও-দিক হবার জো নেই।···বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে···বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে।" ['শিক্ষার মিলন', ১৩২৭]

এই ভাব-নিরপেক্ষ বিবর্তনই মার্কসীয় দর্শনের 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'। বস্তুবাদ বলা হয় এই কারণে যে-হেতু এতে চেতনা-

নিরপেক্ষ বস্তুজগতের মৌলিক অস্তিত্ব স্বীকৃত। একে দ্বান্দ্বিক বলা হয় কারণ বিপরীত শক্তি ও অবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তুজগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, বস্তুজগতের কোনও বিশেষ অবস্থা পরিমাণে বর্ধিত হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে এসে পড়ে যখন সেই পর্যায় বা স্তর—('রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথ যাকে ভিত্তি বলেছেন)—তাকে অতিক্রম করলেই তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে,—যাকে বৈপ্লবিক বলা যায়। যেমন, কোনও দেশে ধনোৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থার প্রবর্তনে, সেই দেশ অচিরে এমন একটা অবস্থায় এসে পড়ে যখন ধনতন্ত্রের জীর্ণ কাঠামোর মধ্যে তার বিস্তার সম্ভব নয়। এই অবস্থায় যে পরিবর্তন আসে, তাকে পুরাতন অবস্থা থেকে নূতনের দিকে একটা উল্লম্ফন বলা যায়। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন উৎপাদন-ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের উপর নির্ভরশীল বটে, কিন্তু ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই এই পরিবর্তন ভ্রূণাবস্থায় অবস্থিত।

এ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কোন্ দিকে ক্রমশঃ প্রবাহিত হয়েছিল, এবং দ্বান্দ্বিক নিয়মানুসারে এই অভিব্যঞ্জনার তাৎপর্য কি—সংক্ষিপ্ত পরিসর মধ্যে তার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হল মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বস্তুচেতনার ক্রমবিকাশ

(১)

এ কথা যেন কেউ না মনে করেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথকে মার্কস্‌বাদের পক্ষপাতী প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছি। এরূপ মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই, কারণ এ সম্বন্ধে তাঁর রচনায় কোনও ইথিতে পাওয়া যায় না। যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ের প্রমাণ তাঁর রচনায় বিক্ষিপ্ত আছে, মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু একজন প্রগতিশীল সমাজ সচেতন সত্যনিষ্ঠ কবির আত্মপ্রকাশে কি-ভাবে মার্কসীয় চিন্তার মৌলিকধারা প্রতিফলিত হয়—(হতে পারে প্রতিফলিত হয় তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে)—'রক্তকরবী'তে পরিচয় লেনিনের উক্তিই প্রমাণিত করে যে, "প্রকৃত মহৎ কবির কাব্যে বিপ্লবের অন্ততঃ কোনও না কোনও গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রতিফলিত হতে বাধ্য।" বিপ্লবের গতি সরল রেখাপথ অনুসরণ করে না: তার অগ্রগতি অত্যন্ত জটিল ও আপাতদৃষ্টিতে অস্পষ্ট। তা সত্ত্বেও বিশ্বঘটনার গতি-প্রকৃতি যে-কবি যতটা নিষ্ঠার সহিত পর্যবেক্ষণ করেন, তাঁর রচনায় তার প্রতিবিম্ব ঠিক সেই পরিমাণে বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই কারণে মহৎ সাহিত্যের তাৎপর্য নির্ণয়ে বাস্তব পটভূমিকার বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের চেতনা কি-ভাবে ভাববাদের কুহেলিকাকে অতিক্রম করে বাস্তবানুভূতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, তার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছি; কি-ভাবে তিনি স্বদেশের গণ্ডী পার হয়ে বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারও পরিচয় দিয়েছি। মনে হয়, এই মানসিক প্রসার ও প্রগতির ফলে ব্যবহারিক জীবনে অলৌকিক শক্তির মঙ্গলময় সক্রিয়তার উপর তাঁর পূর্বকালের বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হয়েছিল।

পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে দেখলেই দেখা যায় শক্তির সঙ্গে শক্তির আপোষহীন লড়াই চলেছে, এবং এই সংঘর্ষে যে দুর্বল সে ক্রমশঃ পেষণীযন্ত্রের উপেক্ষিত মাল-মশলায় পরিণত হচ্ছে। এক্ষেত্রে অহিংস আত্মোপলব্ধির সহায়তায় বলসঞ্চয় করা কার্যক্ষেত্রে কত কঠিন, তা 'মুক্তধারা'র অস্পষ্ট পরিণতি কবির মনে নিশ্চয় সংশয় জাগিয়েছিল।

ধনিকসমাজে এই সংঘর্ষ শ্রেণীবিরোধের আকারে দেখা দেয়। মানবসমাজে শ্রেণী-বৈষম্যের বিপদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন থেকে সচেতন ছিলেন। ১৯১৬ সালে একটি শ্রমজীবীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভেদ বিপ্লবের সূচনা করে: "বৈষম্য হতেই বিপ্লবের সৃষ্টি। এই ব্যবধান দূর করবার উপায় শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।" এখানে নিদান নির্ভুল হলেও দাওয়াই রোগের উপযুক্ত নয়, এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং নেহাৎ মিথ্যাও নয়। কিন্তু অশিক্ষিত শ্রমিককে আত্মসচেতন করতে হবে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে, এটা তিনি বুঝেছিলেন। অবশ্য বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়েও তিনি তখনও তার পরিণাম বা প্রতিকার সম্বন্ধে অনিশ্চিত। এর কয় বৎসর পরে 'অচলায়তন'-এ নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে কবি এই সমস্যা নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছিলেন। এর মূল বিষয়বস্তু—চলমান জগতে সংস্কারের প্রাচীর তুলে অচলায়তন সৃষ্টির চেষ্টা করলে একদিন গুরুর আদেশে সে প্রাচীর বিধ্বস্ত হতে বাধ্য। এখানে গুরু মানে দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষ অথবা অতি-মানবিক শক্তি। ব্যক্তি-জীবনে রবীন্দ্রনাথ এই গুরুবাদকে বার বার ধিক্কৃত করেছেন। কিন্তু সংস্কারের বশে এই গুরুবাদই তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর যুক্তিবাদী মন সংস্কারের কাছে পরাস্ত হল। ভগবৎ-অনুপ্রাণিত কোন নেতার পরিচালনা ব্যতীত কি করে এ জাতীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে তার রহস্য তখনও তাঁর কাছে অনুদ্ঘাটিত। এর পর ১৩২৪ সালের শেষের দিকে রচিত

'আমার ধর্ম' শীর্ষক আত্মচিন্তামূলক প্রবন্ধে তিনি এই 'গুরু'-র আচমকা আবির্ভাব যে কোনও সময়ে সম্ভব, এই ধারণাকে বিশ্বসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বলেছেন :

"আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙতে হবে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চলছিল।"

—অর্থাৎ গুরুর আবির্ভাবে আমাদের চলার পথ খুলে যাবে, আমাদের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন এক মুহূর্তে অপসারিত হবে, এই নৈরাশ্যের আশাই তাঁর অন্তরের আশ্রয় হল। মনে রাখতে হবে, এ রচনা প্রায় রুশ-বিপ্লবের সমসাময়িক, কিন্তু বিপ্লবের স্বরূপ তাঁর নিকট সুস্পষ্ট নয়। দুঃসাধ্য সঙ্কটের সামনে সংস্কারানুবৃত্ত সমাধানের প্রতি এখনও তিনি আস্থাবান। বৈপ্লবিক পরির্তনকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও এর বৈজ্ঞানিক নিয়ম সম্বন্ধে তিনি অনবহিত।

এর পর এই ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি যে নাটক রচনা করেন, তার নাম 'মুক্তধারা' (১৩২৮)। রবীন্দ্র-রচনার মর্ম গ্রহণের পক্ষে এই নাটকটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকদর্শিকা। সমসাময়িক জগতের দুইটি সমস্যা এর প্রতিপাদ্য বিষয়। একদিকে আছে যান্ত্রিক সভ্যতার আসুরিক মূর্তি, যা দেখে সে দিন তাঁর অন্তরাত্মা আতঙ্কিত হয়েছিল। অপর দিকে দেখি, এক দুর্দান্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী পরাধীন জাতির বিদ্রোহ। 'অচলায়ত'ন-এর দেশের পরিবেশ অতিক্রম করে কবি এই সর্বপ্রথম বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হলেন। কবি দেখিয়েছেন উন্নততর যন্ত্রকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপব্যবহার করে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র উন্মত্ত হয়ে ওঠে, এবং স্বাভাবিক মানবিকবোধ হারিয়ে ফেলে। যন্ত্রশিল্প ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও কবির নিকট সুস্পষ্ট, এবং শিবতরাইয়ের জনগণের বিদ্রোহ এক সঙ্গে যন্ত্রশিল্প ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়েরই বিরুদ্ধে, এও কবি নাটকে

দেখিয়েছেন। কিন্তু এই নিষ্পেষণী যন্ত্রের কবল থেকে মুক্তি পাবার যে সমস্যা, তার সমাধানে কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্বেকার ভাববাদী চিন্তাধারা অক্ষুণ্ণ রাখলেন। আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় বৈরাগীর আত্মিকশক্তি সাধনা করার উপদেশ এবং অভিজিতের কল্যাণকামী নেতৃত্বের উপর জনগণের আস্থা—এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক গান্ধিবাদী রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাব, যার মূল কারণ হতবীর্য পরাধীন জাতির বহির্জগতের প্রতিকূলতা থেকে অন্তর্জগতের উপর নির্ভর করার অসহায় প্রবৃত্তি। এখানেও কবির আজন্ম সংস্কার ও বাস্তব পরিবেশ তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাকে প্রভাবিত এবং প্রতিহত করেছে। গান্ধীবাদের আত্মিকশক্তি সাম্রাজ্যবাদীর বুলেটের সামনে যে কত অসহায়, এই রূঢ় বাস্তব সত্য নাটকের অংশ বিশেষে প্রতিফলিত হয়েছে। জনগণের প্রতিবাদ যখন হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করতে উদ্যত, তখনই দেখি ধনঞ্জয় বৈরাগী তাদের সংযত করছে, তাদের উগ্র মনোভাবকে প্রশমিত করছে। 'মুক্তধারা'র বিষয়বস্তু বাস্তবানুগ এবং যুগোপযোগী, কিন্তু বক্তব্য ভাবদ্বন্দ্বে দ্বিখণ্ডিত। একদিকে রয়েছে যন্ত্রের মহিমাকে স্বীকার; অপর দিকে আছে যান্ত্রিক সভ্যতাকে ভয় এবং তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য একটা মনগড়া ভাবাদর্শে আশ্রয় গ্রহণ। একদিকে যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়-জয়কার; অন্যদিকে শিবতরাইয়ের নিপীড়িত জনগণের প্রতি ধনঞ্জয় বৈরাগীর তত্ত্বকথা পরিবেশন আর অভিজিতের নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীলতা। 'মুক্তধারা'র মুখ্য উদ্দেশ্য যে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করা এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু আঘাতের লক্ষ্য কে? রাজা বিশ্বজিৎ, যন্ত্ররাজ বিভূতি, না স্বয়ং যন্ত্রদানব? এবং এর অস্ত্রই বা কি? বৈরাগীর অহিংস প্রতিরোধ, না একা অভিজিতের আত্মবলিদান? এই আক্রমণের লক্ষ্যও শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। কবি কি এই সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যবাদের অবসান কল্পনা করেছেন? না শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে শ্রমিকদের যন্ত্রবিরোধী মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন? 'মুক্তধারা' কবির

মানসিক অগ্রগতির পরিচয় বহন করলেও, তিনি এখনও প্রাক্তন সংস্কার ও বিশ্বাসকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

'মুক্তধারা'র দু'বছর পরে ১৩৩০ বৈশাখে কবি 'রক্তকরবী' লিখলেন। তাঁর পূর্বরচিত সমস্ত রচনা থেকে এর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য। অধিকাংশ সমালোচক এই দুইটি নাটককে এক পর্যায় ফেলে দুটিকেই যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে এবং গ্রামীণ কৃষি সভ্যতার সপক্ষে একটা জোরালো দলিল বলে মনে করেন। এ ধারণা শুধু ভুল নয়, অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক, এবং কবির প্রতি ঘোর অবিচার। গান্ধীজির মতন রবীন্দ্রনাথ কখনও যন্ত্রের ব্যবহারকে নিন্দা করেন নি। বরং প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে যন্ত্রের প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর মতামত ক্রমশঃ সন্দেহাতীত রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'শিক্ষার মিলন' (১৩২৮) শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট বলেছেন আধুনিক জগতের শুক্রাচার্যের নিকট আমাদের যন্ত্রবিদ্যা শিখতে হবে। বলেছেন,

"পশ্চিমের লোক যে বিদ্যার জোরে বিশ্বকে জয় করেছে, সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে।"

বিধাতার সম্পর্কে আমাদের সংস্কারকে উপলক্ষ্য করে, বিধাতারই জবানীতে বললেন,—

"অন্তর রাজ্যে আমাকে [অর্থাৎ, বিধাতাকে] না-হলেও চলবে; ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম; একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, অপর দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম; এ দুয়ের যোগে তুমি বড় হও; জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক,—এ ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।"

পরবর্তী কালে এ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ১৩৩৮ সালে ইউরোপ, বিশেষ করে রুশ থেকে প্রত্যাগমন করে রবীন্দ্রনাথ কোনও প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

"সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত তাতে যেমন আঙুল দিয়ে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় যেখানে পরাজিত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে যন্ত্র সৃজন করে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে

চলেছে।...নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।"

কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োজনকে স্বীকার করে তিনি যান্ত্রিকতাকে আক্রমণ করলেন এই বলে যে, এর প্রভাবে মানুষের লোভ বেড়ে যায়, এবং এই লোভের খাতিরে মানুষ মানুষকে খাটো করে, অপমান করতে দ্বিধা করে না। প্রথম দিকে এর প্রতিকার বিবেচনা করতে গিয়ে তাঁর যুক্তিতে ছেদ পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন 'শিক্ষার মিলন'-এ—এই সমস্যার একমাত্র সমাধান উপনিষদের নির্দেশে,—ত্যাগের দ্বারা লোভকে জয় করতে হবে। বলেছিলেন, এই সমস্যার একমাত্র নিষ্পত্তি সেই পরম একের মধ্যে—যাকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করলে সর্বজনের মধ্যে পাওয়া যাবে, এবং পাওয়া মাত্র চা-বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে চা-বাগানের কুলির শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের নিরসন হবে। এ সেই কার্লাইল-এর 'চিরন্তন আস্তিক্য' যার মধ্যে সমস্ত বিরোধের সমাধান হয়।

কিন্তু 'রক্তকরবী'র মূল বক্তব্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে সেখানে এই অস্পষ্ট ভাববাদী সমাধানের ইঙ্গিত মাত্র নেই। এখানে ঐশ্বরিক আনুকূল্য বা মানুষের শুভবুদ্ধির উন্মেষের উপর নির্ভরতা কোথাও নেই। তার পরিবর্তে বলছেন লোভের নিবৃত্তি তবেই সম্ভব যদি "লোভের বিষদাঁত" ভেঙ্গে দেওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষের সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলেই শ্রেণীসংঘর্ষের অবসান হতে পারে,—অন্য কোনও পন্থা নেই। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন 'রক্তকরবী'কে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

(৩)

সমাজ বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে মানবিক চেতনাসম্পন্ন কোনও কবির মানস-অভিযানের গতি প্রায়ই অবক্র হয় না। পূর্বসংস্কারের দ্বিধা, আগামীকালের সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা, শ্রেণী-

দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেও তার প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি কবিকে বারবার দিক্‌ভ্রষ্ট করেছে। অনগ্রসর এবং স্বাধিকার বর্জিত দেশে এ জাতীয় বিভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ সব প্রতিকূলতাসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও দর্শনের বাস্তবতা আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। তাঁর সমকালীন দেশবাসীর চিন্তাকে তিনি সবদিক্ থেকে অতিক্রম করেছিলেন, এ কথা বললে অল্পই বলা হয়। আগামীকালের সম্ভাবনার রূপকল্পনায় তাঁর দূরদৃষ্টি প্রতীচ্য চিন্তানায়কদেরও অনেককে অতিক্রম করেছিল। সেই জন্য অনেক সময়ে বলতে ইচ্ছা হয় যে,(শেলী যেমন ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড'-এ এক নূতন সমাজের রূপ কল্পনা করে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি রুশ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষণিকায় রবীন্দ্রনাথ 'আকর্ষণজীবী' (acquisitive) সমাজের ধ্বংসের পরে 'কর্ষণজীবী' (productive) সভ্যতার আসন্নতা কল্পনা করে ফসল-কাটার গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন নাটকের চরম মুহূর্তে।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূচনা ও পরিবেশ

(১)

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার আমাদের জানিয়েছেন যে, ১৩৩০ সালের বৈশাখে শিলং-এ অবস্থান কালে কবি অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মুখে বোম্বাইয়ের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-জীবনের কাহিনী গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেছিলেন। যে বোম্বাইয়ের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল যৌবনের প্রারম্ভে, আজ সে 'রোম্যান্টিক' বোম্বাই বহুদূরে। সামন্তযুগের অবসানে শিল্পযুগের আরম্ভিক পর্বের সূচনা করেছে এই নূতন বোম্বাই; মিল-মালিকদের 'রক্তমাখা দন্তপংক্তি'-র যথার্থ রূপ কবির চোখের সামনে ফুটে উঠল। এই রূপ তিনি দেখেছেন ইংলণ্ডে, দেখেছেন আমেরিকায়, কিন্তু এই প্রথম মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বারে তাঁর কবি-মানসকে সচকিত করল 'ঘুমভাঙ্গানিয়া' রুদ্র-কণ্ঠের আহ্বান 'অয়মহং ভোঃ'।

যদিও রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে, একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যের প্রভাবে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেছিলেন, তবু বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। বিসদৃশ বা নিয়মের ব্যতিক্রম বলে তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন নি। এই নূতন—সম্পূর্ণ নূতন—মানসিক অভিজ্ঞতা তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব 'রক্তকরবী'র প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট। সর্দারদের বিরুদ্ধে খোদাইকারদের যে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার নগ্নরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে কোনও অস্পষ্টতা নেই, ভুল বোঝবার অবকাশ নেই। 'রক্তকরবী'র বস্তুচেতনাকে তাঁরাই অস্বীকার করবেন বা অপ্রধান প্রতিপন্ন করবেন যাঁরা নাটকের এই বাস্তব সূচনার গুরুত্বকে হ্রাস করবার চেষ্টা করবেন। অতএব কবিকে তাঁর ঔপনিষদিক

গজদন্তমিনার থেকে বস্তুজগতের কঙ্করময় পথে নামিয়ে আনবার কৃতিত্ব রাধাকমল বাবুর প্রাপ্য। (অর্থনীতিবিদের বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠাই নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছে,) এতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং (এই কারণেই এর অভিব্যক্তি একান্ত বাস্তবানুগ, এর ভাষা তীক্ষ্ণ ও জোরালো, এর পদক্ষেপ নিঃশঙ্ক ও লক্ষ্যসন্ধানী।)

অবশ্য প্রাঞ্জলতার অভাব যে নেই এ কথা বলা যায় না ; যদি না থাকবে এ নিয়ে এত বাক্‌বিতণ্ডা কেন ? এর জন্য কিছুটা দায়ী নাটকের আঙ্গিক, কিছুটা দায়ী নূতন পথানুসরণে বৃদ্ধ কবির স্বাভাবিক দ্বিধা, এবং অনেকটা দায়ী এ জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক রীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। প্রতিকী নাটকের ইঙ্গিত যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি এতে বস্তুর স্পষ্টতা কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব -এই অস্পষ্টতায় ছায়াচ্ছন্ন করেছিল। অত্যন্ত মর্মসন্ধানী কবির পক্ষেও কল্পনা কখনও বাস্তব অভিজ্ঞানের অভাব পূরণ করতে পারে না। এ সব স্বীকার করেও যদি আমরা সংস্কারমুক্ত মনে নাটকের ইঙ্গিত অনুসরণ করি, আমরা ভাববাতিকগ্রস্তের মতন কল্পনার গোলকধাঁধায় দিক্‌ভ্রষ্ট হব না নিশ্চয়। অর্থাৎ সচরাচর যাকে রাবীন্দ্রিক canon বা রচনারীতি বলে মনে করা হয়, এ ক্ষেত্রে সেটাকে উপেক্ষা করে নাটকের মর্মে প্রবেশ করতে হবে। কারণ যদিও 'রক্তকরবী' এই রীতির একদিকে পরিপূরক, যে হেতু কবির সর্বাধুনিক অভিজ্ঞানের এটি সুসমন্বিত রূপায়ন, অপর দিকে এটি সেই রীতির ঘোর ব্যতিক্রম, কারণ এর প্রতি পদে প্রাক্তন সংস্কারকে অতিক্রম করে বস্তুসত্যকে স্বীকার করেছেন।

(২)

তত্ত্ববিশ্লেষণে প্রবেশ করবার পূর্বে দু'একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। (নাটকটির রচনাকালে সারা দেশ

বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীর কঠোর শাসনে নিপীড়িত। একদিকে গান্ধিজীর নেতৃত্বে গণজাগরণের ব্যাপকতা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, অপর দিকে রুশ বিপ্লবের তরঙ্গ-ভঙ্গে দেশের শ্রমিক আন্দোলন নূতন পথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা তাদের আরও বেশী আতঙ্কিত করেছিল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যুব-আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনকে মিলিত করবার একটা চেষ্টা সঙ্গোপনে চলছিল, এবং একটি সাম্যবাদী দলের গোড়াপত্তনের কাজ আড়ালে-আবডালে অগ্রসর হচ্ছিল, এ সব খবর ইংরাজ শাসকবর্গের নিকট অজানা ছিল না। তাদের গোয়েন্দা বিভাগ এই সব গোপন ষড়যন্ত্রের গুহ্যতম অলি-গলির সন্ধান নিশ্চয় রাখত। এদের তৎপরতা সম্বন্ধে 'ন্যাশ্যানালিজ্‌ম্'-এ কবি বলেছেন ঃ

> "একটা বোতাম টিপলেই এদের দানবীয় শাসনযন্ত্র সর্বাঙ্গে চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে একজনেরও সেই সর্বসন্ধানী কুটিল দৃষ্টিকে এড়াবার সাধ্য নেই।"

—এ জাতীয় গোয়েন্দার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ঘৃণা 'রক্তকরবী'র মোড়লের চরিত্রে ফুটে উঠেছে।

সাঙ্কেতিক নাটকের আঙ্গিকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। কোন গূঢ় ভাবব্যঞ্জনায় এর সার্থকতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নেই। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে সাঙ্কেতিক ইঙ্গিত ব্যবহার করাই তাঁর পক্ষে সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। কোনও এক প্রসঙ্গে কার্লাইল বলেছিলেন, "সঙ্কেতে অপ্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব ; এক সাথে বাচন ও নির্বাচন একত্রিত ব্যবহারের ফলে ব্যঞ্জনা দ্বিগুণিত হয়।" যেটা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহতাকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা সম্ভব। 'রক্তকরবী'র বিপ্লবাত্মক ব্যঞ্জনা মনে রাখলে বোঝা যাবে সে যুগে এই রীতি অবলম্বন করাই বৃদ্ধ কবির পক্ষে সঙ্গত ছিল। এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই নাটকের প্রস্তাবনার ভাষা ও বক্তব্য যেন আরও কুহেলিকাময়। নাটকের বাস্তব পরিবেশ সম্পূর্ণ

উপেক্ষা করে একে রূপকথা ও রূপকে পরিণত করলেন,) সীতা-হরণের পালার সঙ্গে এর একটা ধোঁয়াটে সাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। রাবণের সঙ্গে 'রাজা'র সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়, কিন্তু সীতা ও 'নন্দিনী' উভয়ই মানবকন্যা—এর বেশী কিছু বলা যায় না; এবং এ সমীকরণের সার্থকতাও বোঝা যায় না। কিন্তু অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করা এই দুর্বোধ্যতার খাতিরে প্রয়োজন ছিল।

(১৯২৪ সালে নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ 'বিশ্ব-ভারতী'র ইংরেজী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ মহলের টনক নড়ল। কিন্তু নাটকটি 'দুরভিসন্ধিমূলক' জেনেও যে এর বিরুদ্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি হয় নি তার একমাত্র কারণ নাটকটি দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছিল। নাটকের উপর রূপকের ইঙ্গিত প্রযুক্ত হওয়ায় এর নির্গলিত অর্থ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। অপ্রধান চরিত্রদের কথাবার্তায় বাস্তবের রুক্ষ রূপরেখা স্পষ্ট আকার ধারণ করলেও, প্রধান চরিত্রগুলির সাঙ্কেতিক অস্পষ্টতার জন্য ব্যাখ্যায় যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হল। বিশেষতঃ এর বাস্তব ইঙ্গিত 'মুক্তধারা'র চেয়েও নিতান্ত রাবীন্দ্রিক রীতিবিরুদ্ধ হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচরদের মধ্যে অন্যতম চারু বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে অস্পষ্টতার অভিযোগ করা হয় তা "এ নাটকটির বিরুদ্ধে যত বিঘোষিত হয়েছিল এমন আর অন্য কোনও নাটকের বিরুদ্ধে হয় নি" ('রবিরশ্মি') পরবর্তী কালের আলোচনায় এই মতই সমর্থিত হয়েছে।)

(৩)

আর একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ কত আগ্রহভরে তাঁর নাটকগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' তাঁর জীবদ্দশায় 'বিশ্ব-ভারতী'র তত্ত্বাবধানে অভিনীত হয় নি। কবি নিজে একবার 'রক্তকরবী'র মহড়ার

প্রাথমিক উদ্যোগ করেছিলেন, কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁর এক পত্রে উল্লেখ আছে উপযুক্ত 'নন্দিনী'র অভাবের জন্য এ চেষ্টা থেকে বিরত হতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যগুরু, শান্তিনিকেতনের মত কলাচর্চার পীঠস্থান,—এ হেন যোগাযোগ যেখানে বর্তমান, সেখানে 'নন্দিনী'র অপ্রাপনীয়তা একটা কৈফিয়ৎ মাত্র। আসল কথা, অভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তব চরিত্রগুলির ভাষা অবাঞ্ছনীয়রূপে প্রকট হওয়াতেই কবি সঙ্কল্প থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে 'মুক্তধারা'য় আক্রমণের মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ হওয়াতে কবি এর অভিনয়ের কথা কখনো চিন্তাও করেন নি।

এই অবাঞ্ছনীয়তার স্বরূপ বোধগম্য হবে যদি আমরা বর্তমান কালে শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'বহুরূপী'র বাস্তবানুগ প্রযোজনায় আপত্তির কথা স্মরণ করি। এঁদের আপত্তির কারণ ছিল রবীন্দ্র-নাটকের তুরীয়মার্গ পরিত্যাগ করে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে 'বহুরূপী' নাটকটিকে উপস্থাপিত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের কলাবিদ্‌দের চোখে যা দৃষ্টিকটু লেগেছিল, তাতে ইংরাজ আমলে লালবাজারের কর্তৃপক্ষদের চক্ষু যে কতটা রক্তবর্ণ হওয়া স্বাভাবিক ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

মোট কথা কি প্রকাশনে, কি প্রযোজনায়, প্রভাতবাবু নাটকটি সম্বন্ধে কবির মনে যে দ্বিধার উল্লেখ করেছেন, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এবং সে দ্বিধার কারণ তার গূঢ় মর্মার্থ নিয়ে; বেশী টানাটানি করলে তা অনর্থ ঘটাতে পারে এই আশঙ্কাই কবি পাকে-প্রকারে প্রকাশ করেছেন। এ যদি সাধারণ রবীন্দ্র-রীতির অন্তর্গত হত তা হলে কবির মনে এ জাতীয় দ্বিধার কারণ নিশ্চয় ঘটত না। এই কথাগুলি স্মরণ করে আমরা মূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'রক্তকরবী'তে শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ

(১)

'রক্তকরবী'র 'প্রস্তাবনা'র ভাষা দুর্বোধ্য হলেও তা থেকে আমরা এর অর্থ সম্বন্ধে মূল্যবান ইঙ্গিত পাই। কবি অবশ্য নিবেদন করেছেন, যদিও সমালোচকেরা "পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ বের করবার চেষ্টা করবেন", "যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়"। অতএব " 'রক্তকরবী'র অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তার দায় কবির নয়।" কিন্তু অর্থ খুঁজতে গেলে তার সার্থকতা চলে যাবে কেন, আর অনর্থ ঘটবেই বা কেন, এ-ধরণের হেঁয়ালী উত্থাপন করে দায়মুক্ত হওয়া কোনও কবির পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ অর্থকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম ; ভাষাগত হেঁয়ালীর আড়ালে ভাবকে প্রচ্ছন্ন তিনিই রাখবেন যাঁর ভাবে বা অনুভবে পরিপূর্ণ উপলব্ধির অভাব। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ অপবাদ অকল্পনীয়।

কবির এই উক্তির আসল তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টির তাগিদে নাটকটিতে এমন সব ভাব আত্মপ্রকাশ করেছে যা সত্যসন্ধানী কবির পক্ষে যেমন না লেখাও অসম্ভব, তেমনি পূর্বসংস্কারের পরিপন্থী বলে তাকে গ্রহণ করাও প্রীতিকর নয়। কিন্তু মহৎ কবি সত্যদর্শন ও সত্যপ্রকাশনের মধ্যে প্রাক্তন সংস্কার ও বর্তমান পরিবেশের ব্যবধান অতিক্রম করতে বাধ্য। এই জন্য তিনি মূলতঃ বিপ্লবী ; অজানা পথের দুঃসাহসী অভিযাত্রিক। বর্তমানের পরিবেশকে নানা দিক দিয়ে অনবরত বিচার করে পাঠকের কর্তব্য কবির ভাবকে সংস্কারমুক্ত মনে গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে, কোনও প্রকার সংস্কার বা শাস্ত্রবাক্য দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে, আমরা নাটকের ভাষার স্পষ্ট ইঙ্গিত অনুসরণ করে তার মর্মস্থলে পৌঁছাবার চেষ্টা করব।

('রক্তকরবী' যদি আদ্যোপান্ত মন দিয়ে পড়া যায়, পাঠকের মনের মধ্যে এই ধারণাটা থিতিয়ে থাকা অনিবার্য যে, একটি বিশেষ সমাজে শ্রেণীবদ্ধ মানুষের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চলেছে, এবং অবশেষে তার অবসান হ'ল একটা বৈপ্লবিক বিক্ষোভের মধ্যে। এই ধারণা সমর্থিত হয়েছে কবির উক্তিতে: "এর বিষয়বস্তু হল ব্যক্তিগত মানুষ আর মানুষগত শ্রেণীর পরস্পরের বিরোধ।" ব্যক্তিগত মানুষ যেমন আশা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, বিদ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশবর্তী, যেমন সাংসারিক ও সাংস্কারিক সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তেমনি মানুষগত শ্রেণীও নানাবিধ স্বার্থ-প্রয়োজনের অধীন, এবং এর ফলে প্রত্যেকটি মানুষ স্ব স্ব শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে সংঘবদ্ধ হ'তে বাধ্য হয়। মানুষের এই সংহতির চেষ্টা তার পরিবেশ ও বৃত্তি দ্বারা চালিত হয়। নাটকে দেখি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষ ক্রমশঃ অবস্থার চাপে ও স্বার্থের প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে; গোড়ার দিকে এই সব শ্রেণীবদ্ধ মানুষের মধ্যে নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা থাকলেও ক্রমশঃ তারা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। একদিকে তাদের অভাব-অভিযোগ শ্রেণীসংঘাতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। অপর দিকে এই শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিমুহূর্তে ব্যক্তিচেতনাকে কখনও আঘাত, কখনও আচ্ছন্ন, কখনও বা উদ্বুদ্ধ করে। নাটকে বিভিন্ন সময়ে ও পরিবেশে কারিগর ও সর্দারের মধ্যে সম্পর্ক-পরিবর্তনের যে তারতম্য এইটাই তার তাৎপর্য।)

(২)

কবি 'শ্রেণী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথাটা ভুলে যেতে বলেছেন। কারণ যে প্রসঙ্গে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তা মার্কস্‌বাদের শ্রেণীসংগ্রামের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ, এইটাই মার্কস্‌বাদের মৌলিক ধারণা; সমাজে এই

বিভাগ ব্যতীত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অকল্পনীয়। মনে রাখতে হবে এর মানে শুধু ধনী ও গরীব, অথবা মালিক ও মজুরের মধ্যে যে চিরকালের বিভেদ এ শুধু তাই নয়;—যে-জাতীয় বিরোধ অনেকেই স্বীকার করেছেন, কাব্যে-উপন্যাসে বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু সেখানে এ বিরোধ অনাপোষণীয় বলে মনে করা হয় নি; সেখানে নানা প্রকার রোম্যাণ্টিক সমাধানের মধ্যে এর নিষ্পত্তি কল্পিত হয়, যথা, মালিকের মনে দয়া, ধর্ম প্রভৃতি শুভবুদ্ধির জাগরণ, শ্রমিকের আনুগত্যে প্রতিফলিত আপোষমূলক মনোভাবের উন্মেষ, মালিক শ্রেণীর কারও সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয়ের শুভবিবাহে দ্বন্দ্বের আনন্দময় নিরসন, ইত্যাদি। কিন্তু মার্কস্‌বাদের বৈজ্ঞানিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে এ-জাতীয় সমাধান অসম্ভব এবং হাস্যকর,—যেহেতু এ দ্বন্দ্ব মৌলিক, পণ্যোৎপাদন এবং পণ্যবন্টনের শ্রেণী-স্বার্থঘটিত ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; এর একমাত্র নিরসন সম্ভব শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা অধিকারে যা শুধু গণবিপ্লব দ্বারা সংঘটিত হ'তে পারে। এই অর্থে 'শ্রেণী' শব্দের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিস্ময়কর নিশ্চয়, কিন্তু 'রক্ত-করবী'তে সমাজ-জীবনের যে 'প্যাটার্ণ' তিনি সংকলন করেছেন, তার সঙ্গে 'শ্রেণী' শব্দ একমাত্র এই অর্থে প্রযুক্ত হ'তে পারে। শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃত রূপ ও ইঙ্গিত উপলব্ধি করে কবি বলেছেন: এ-যেন দুটো বিভিন্ন ধর্মী সভ্যতার মধ্যে বিরোধ,—একদিকে 'আকর্ষণ'জীবী সভ্যতা; অপর দিকে 'কর্ষণ'জীবী সভ্যতা। শব্দ নির্বাচনেই কবির অভীপ্সা ধরা পড়ে।

সাধারণতঃ 'কর্ষণ' শব্দটি মাটি কেটে চাষ করার অর্থে নেওয়া হয়; তাই 'কর্ষণজীবী' সভ্যতাকে কৃষিপ্রধান সভ্যতা অর্থে অন্বয় করা হয়ে থাকে। এই অর্থ গ্রহণ করলে আমাদের সংস্কার বৃত্তিও সন্তুষ্ট হয়, যেহেতু আমাদের অনেকের মনে কৃষিজীবনের একটা idyllic চিত্র অঙ্কিত আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে নাটকটি সংকেতময়; এতে শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা অতিক্রম করে আছে একটা ব্যাপকতর

প্রতীকী ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাটকে রূপকল্পিত সংকেতের যথার্থ অবধারণায়। নাটকে ব্যবহৃত রূপকল্পের মাধ্যমে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তার ইঙ্গিত অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। কৃষির উদ্দেশ্য খাদ্য উৎপাদন করা; অতএব 'কর্ষণ' অর্থে কবি সেই সভ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যার উদ্দেশ্য উৎপাদন করা, যা 'আকর্ষণ' অর্থাৎ সংগ্রহ করা, নিজের দিকে টেনে আনবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করার বিপরীত। নাটকোল্লিখিত সর্দারেরা এই আকর্ষণজীবী সমাজের ধারক ও পরিচালক। এরা জমিদার নয়; এরা মূলধনের মালিক; এরা পরের পরিশ্রমে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য কেড়ে নিয়ে সুখে-সমৃদ্ধিতে জীবিকা নির্বাহ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে আকর্ষণজীবীদের হাতেই রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা সংরক্ষিত। তারা সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে বা অপব্যবহার করে প্রধানতঃ সমাজে নিজেদের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাকে বজায় রাখবার জন্য। কবি এর পরিচয় দিয়েছেন সর্দার বধূদের উৎসব-বিলাসের পার্শ্বচিত্রে ও মোড়লের সঙ্গে সলা-পরামর্শে। শ্রমিকদের মধ্যে যারা ভীরু, অনগ্রসর, কিংবা ঐশ্বর্যের জৌলুষ দেখে মুগ্ধ, তাদের মন নির্দ্বান্দ্বিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং সব রকম প্রগতি-বিরোধী সংস্কারকে সহজেই স্বীকার করে নেয়। কিন্তু নেতৃত্ব করে তারাই যারা অত্যন্ত শ্রেণী-সচেতন এবং চূড়ান্ত অবস্থার জন্য প্রস্তুত।

(৩)

এই ব্যাখ্যা যে আমাদের অধ্যারোপ নয়, এ যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তার সূচনা, এ প্রতীয়মান হবে আমরা যদি তাঁর পরবর্তী কালের মতামতের দিকে নজর দিই। শ্রেণী-বিরোধের তত্ত্বটি কবি দশ বৎসর পরে অন্য এক প্রসঙ্গে প্রাঞ্জলতর ভাষায় বিবৃত করেছেন। বলেছেন:

"পৃথিবীর ধন-উৎপাদক এবং অর্থ-সঞ্চয়িতার মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ

বিরোধ হয়ে উঠেছে। এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন আসছে যে যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণ বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে—কেন না শুধু যে ঋণ পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমা হয়ে।" [১৩৪০]

—ঋণের উল্লেখ যেমন তাঁর পূর্বসংস্কারের অন্তর্গত, তেমনি শাস্তির অবশ্যম্ভাবিতা একটি নূতন সুর আমদানি করেছে। অন্যত্র তিনি বলেছেন :

"এ পেটুক সভ্যতার ন্যায়সঙ্গত অবসান হবে কি করে? অধিকাংশ মানুষকে অল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশ্যে কি চিরকাল উৎসর্গ করা হবে?···সভ্যতার এই ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলাম রাশিয়ায় গিয়ে; মনে হয়েছিল নর-মাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাচব।··· জানি প্রকাণ্ড একটি বিপ্লবের উপর নবযুগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে—কিন্তু এ বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব,—এ-বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিপ্লব।" [১৩৪২]

—এই উদ্ধৃতিতে নাটকের অস্ফুট ব্যঞ্জনাই কি পরিস্ফুট নয়?

অতএব 'রক্তকরবী' যে এই মনোভাবেরই পূর্বাভাস এটা কল্পনা নয়, এটা তাঁর প্রগতিমুখী চেতনার অভিব্যক্তি। নাটকের মূল দ্বন্দ্ব সর্দার আর শ্রমিকের মধ্যে। সর্দারেরা উপরতলার লোক, পরশ্রমজীবী। যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এদের চিহ্নিত করেছেন তা গভীর শ্রেণী-চেতনায় অভিষিক্ত। এরা 'নরমাংসভোজী'; ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক বলেছেন "বাঘকে বাঘ খেয়ে বড়ো হয় না; কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।" এই অমানুষিক অবস্থার অবসান ঘটতে পারে সমাজের ভিত্তি বদলে;—যখন "সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চিড়" লেগে তলাটা ভিতরে ভিতরে কাৎ হবে, আর "জমাজল পাগলের অট্টহাসির মতো খল খল করে বেরিয়ে চলে যাবে।" এই প্লাবনের রূপকল্পে বিশিষ্ট সমাজের কারাগার থেকে মানুষের মুক্তি অভিব্যক্ত।

এর প্রয়োগ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে শুরু করে 'মুক্তধারা' পর্যন্ত বারবার কবি ব্যবহার করেছেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে। একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সমাজের ভিত্তিবদলের সহায়তা করতে পারে সমগ্র নাটকটি এই ইঙ্গিত নির্ভুলভাবে বহন করছে।

(৪)

এ-কথা স্বীকার্য যে যে-সময়ে কবি 'রক্তকরবী' রচনা করেন, তখন হয়ত তাঁর মনে এ-জাতীয় ধারণাগুলি এত স্পষ্ট ছিল না। শিল্পসৃষ্টির রহস্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর। শিল্পীর অবচেতন মন প্রতি-বিম্বগ্রাহী স্পর্শসচেতন চলচ্চিত্রের 'ফিল্‌ম্'-এর মতন। তাঁর অজ্ঞাতসারে চলমান জগতের নিত্য পরিবর্তনশীল প্রতিচ্ছায়া তার উপর অনবরত প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। শিল্পীর স্মৃতি-ভাণ্ডারে সযত্নে সঞ্চিত ও সুরক্ষিত এই চলচ্চিত্র তাঁর সৃষ্টির মাল-মশলা। নিত্য পরিবর্তনশীল মনের এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একে প্রতিনিয়ত নূতন রঙে রঞ্জিত করছে, নূতন রূপে রূপান্তরিত করছে—নিত্য-নবীন অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রসার ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। মন যে পরিমাণে স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত, তার রূপায়ণ সেই পরিমাণে সজীব, সত্যনিষ্ঠ ও দ্যোতনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। যেখানে এবং যে মাত্রায় এই স্বচ্ছতা ও সংস্কারমুক্তির অভাব, অর্থাৎ যেখানে প্রাচীন ঐতিহ্য অথবা বিশ্বাস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপরেখাকে ঝাপসা করে দেয়, সেখানে এবং সেই অনুপাতে শিল্পে তার প্রকাশ খণ্ডিত ও অর্ধসত্য প্রতিপন্ন হয়। এইজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনের সজীবতা, নূতনকে অনায়াসে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যেখানে নেই, সেখানে কবি দক্ষ কারিগরে পরিণত হয়; অন্তঃসারশূন্য চমক লাগানো ভাষা প্রয়োগের কেরামতি কিংবা দুর্জয় আবেগজনিত অতিশয়োক্তি দ্বারা কবি মনের এই মৌলিক

সক্রিয়তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। এইখানেই ক্ষুদ্র কবি ও মহৎ কবির প্রভেদ। মহৎ কবির মন অচল নয়, কোনও নির্ধারিত সীমারেখার গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। তাই তিনি চিরদিন "নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সঙ্গে যোগ দিয়ে অসীম ব্যর্থতা" থেকে নিজেকে রক্ষা করেন, বাঁচাবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এ চেষ্টা প্রায়ই কবির অগোচরে সম্পাদিত হয়: এমন কি অনেক সময়ে কবির সচেতন মনের স্পষ্ট অনুমোদন ব্যতিরেকে কাজ করে। অর্থাৎ কবির অবচেতন মনের সক্রিয়তাই তাঁর আত্মপ্রকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। অবচেতন মন পূর্বার্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার সমষ্টিগত সত্তা। কল্পসৃষ্টির এ রহস্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের 'কৌতুকময়ী' কবিতাতে ব্যক্ত করেছেন। 'কৌতুকময়ী' কল্পনা কবি-মানসের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া; এ কবির অগোচরে কাজ করে যায়; নিত্য নূতন অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট মনন শক্তিকে চির নূতনের সন্ধানে নিযুক্ত করে, অভাবনীয়ভাবে তাকে নূতন জগতের সৃষ্টিতে নিযুক্ত করে। কবি বলেছেন :

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা কিছু বলিবারে চাই
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ,
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই
সঙ্গীত স্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝিনা জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছ কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার—
দেখে তুমি হাস বুঝি।

—'যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা, যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা': জর্জ টমসন ঠিকই বলেছেন যে, শিল্পী কি করেন তা তিনি নিজেই ঠিক জানেন না। তিনি ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখেন মনন দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী বোঝেন; কারণ তিনি ধী-গুণ-সম্পন্ন। এবং তাঁর এই ধী-গুণের গভীরতাই তাঁর যথার্থ পরিচয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"জীবনের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা বলিনে, সেই আমার গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়।"

—এ সত্যদর্শনের শুচিতা তাঁকে সাহিত্য-জগতে অমর করে রাখবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্থান—কাল—পাত্র

(১)

'রক্তকরবী' যে শ্রেণীসংগ্রামেরই চিত্র এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কবি বলেছেন: "এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।" কোন সমাজে বা সমাজের কোন স্তরে এই সংগ্রাম সত্য তা বোধগম্য হবে নাটকের স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করলে।

নাটকটি যে কৃষিসমাজের বা সভ্যতার চিত্র নয়, অথবা সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের চিত্র নয় তা বোঝা যাবে খোদাইকারদের বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখলে, এবং সর্দার ও শ্রমিকদের সম্পর্কের প্রকৃতি অনুধাবন করলে। সামন্ত যুগে শোষিত জনগণের উপর জমিদারদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধন ছিল, যার লেশমাত্র সর্দারদের প্রতি খোদাইকারদের মনোভাবে নেই। এদের বৃত্তি এবং মানবিক সম্পর্কাদি বিচার করলে সন্দেহ থাকে না যে আসলে নাটকটি ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিণত অবস্থার চিত্র, যখন দীর্ঘকাল শোষণের ফলে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, এবং সেইসঙ্গে অমানুষিক অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শোষক-শ্রেণীর মধ্যেও মানবিক কারণে ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্ব বিপ্লবকে আসন্ন করে তুলেছে। 'মুক্তধারা'য় রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন তা যন্ত্রযুগের প্রারম্ভিক পর্বের। এখানে প্রধানতঃ কবির দৃষ্টি পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী সমাজে ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারের উপর। কিন্তু 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'কর্ষীয়

সভ্যতা' তারই চিত্র, যাতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের আসন্ন সংকট প্রাধান্যলাভ করেছে। ঘুরে ফিরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যাদের তিনি 'সর্দার' অভিধায় অভিহিত করেছেন, সেই ঐশ্বর্যে স্ফাতকায়, ক্ষমতায় মদগর্বিত উপরতলার মানুষ রাষ্ট্র-শক্তিকে হস্তগত করে তাদের নিষ্ঠুর শোষণবৃত্তি চরিতার্থ করছে। কবি যাকে 'জটিল জালের আবরণের আড়ালে রাজা' বলে বর্ণনা করেছেন, সে এদের উদ্দেশ্য সাধনার্থে নিপীড়ন যন্ত্রমাত্র, যাকে আমরা রাজশক্তি বা রাষ্ট্র বলে থাকি। রাষ্ট্র নিজে ভোগ করে না; সে শুধু প্রজাদের রক্তবিন্দু নিঙড়ে নিঙড়ে ধন সংগ্রহ করে যা ভোগ করে সর্দারের দল, ধনিক সম্প্রদায়।

সর্দারদের নীচেই তাদের সমর্থক ও পরিপোষকের দল,—মধ্যবিত্ত সমাজের অধ্যাপক, গোঁসাই, পুরাণবাগীশ প্রভৃতি,—যাদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলে থাকি, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগকুশলতাই এদের মূলধন। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের বৃত্তি ও প্রকৃতি অনুসারে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। এরা নিজেরা মুনাফাখোর নয়, কিন্তু নিজেদের স্বার্থ মুনাফাখোরদের সঙ্গে জড়িত বলে স্বাধীন চিন্তা বা কর্মশক্তি হারিয়ে এরা নিয়োগকর্তাদের তল্পিবাহকে পরিণত হয়েছে। এদেরই বহিঃসামানায় আছে আর এক জাতীয় লোক যাদের প্রতিভূ 'মোড়ল' অর্থাৎ গোয়েন্দা-গুপ্তচরের দল, যাদের "দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতে ঘেন্না করে", অথচ স্বার্থের খাতিরে যাদের "সভার মাঝখানে সুহৃদ্ বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়।" বুর্জোয়া সমাজে এদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট স্থান ও প্রয়োজন আছে, নির্ধারিত ভূমিকা নির্দিষ্ট আছে; তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে কায়েম করা, চালু রাখা। 'মোড়ল'-এর কাজ তোষামোদ ও জঘন্য গুপ্তচর বৃত্তি। ছোট বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এদের বিষাক্ত মোলায়েম প্রকৃতির পরিচয় কে না জানে? 'গোঁসাই' ধর্মের বুলি আউড়ে

নীচুতলার মানুষের মনকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে; এদের আসল ভূমিকা সাধারণ মানুষকে ধর্মের মৌতাত জোগান দিয়ে নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় করে রাখা; তাই এরা শোষকশ্রেণীর একান্ত অনুগত সমর্থক: কবি শ্লেষাত্মক ভাষায় এই তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন,—"চাবুকের সুতো দিয়ে ওর জপের মালা তৈরী"; "ওর এক পিঠে গোঁসাই, আর এক পিঠে সর্দার। নামাবলীটা ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে।" রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তথাকথিত ধর্ম বড়লোকের পোষকতা করে, আর গরীবকে স্তোকবাক্য শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখে, যে কারণে ধর্মকে মার্কস্ 'জনগণের আফিম' বলে অভিহিত করেছেন। আকর্ষণজীবী সমাজে পুরোহিত ও শাসকগোষ্ঠীর যোগসাজোশ ইতিহাস-সমর্থিত রূঢ় সত্য।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে 'অধ্যাপক' সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সমাজ-সচেতন। সে 'নন্দিনী'র তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। শ্রেণী-দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন বিপ্লবের আভাসে সে সচকিত হয়ে উঠে বলে, "কিছু দিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে ওর সঞ্চয় সরোবরের পাথরটাতে চীড় লেগেছে।" এখানে 'সঞ্চয়' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এই উপলব্ধির আগে সে একপ্রকার 'অস্তিত্ববাদ' প্রচার করে সমাজে রক্ষণশীল মনোভাবকে পরি-পুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। বুঝিয়ে বলেছে, "তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয়, সেটা হয়। তার বিরুদ্ধে যাওয়া ত হওয়ার বিরুদ্ধে যাওয়া।" অধ্যাপকের এই নৈরাশ্যবাদী মনোভাব সক্রিয় কর্মবাদের মূলে আঘাত করে; অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনাকে সুদূরপরাহত বলে প্রতিপন্ন করে। এই তত্ত্ব প্রচারে আমরা পরবর্তী কালে সার্ত্র (Sartre) প্রচারিত অস্তিত্ব-বাদের আভাস দেখতে পাই। এইভাবে নিজের বস্তুতত্ত্বের ভাণ্ডার উজাড় করে যখন অধ্যাপকের ঝুলি শূন্য হয়ে গেল, সে প্রাচীনের মহিমা কীর্তন করে রাজাকে ভুলিয়ে রাখবার প্রয়োজনে 'পুরাণবাগীশ'কে

নিয়ে এল; সে মহামাতব্বরী চালে সকলকে বুঝিয়ে বলল, "পিছন যদি না থাকে তো সামনেটাই কি থাকতে পারে?" সাহিত্যে এ-জাতীয় বাক্‌চাতুরীর একটা তাৎপর্য আছে। এই প্রকার অন্তঃসারশূন্য ভাষার চমক-লাগানো ভঙ্গী দেউলিয়া মনের পরিচায়ক। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের পুরাতনকে নূতনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করবার প্রবণতা আমাদের কাছে অবিদিত নয়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি অধ্যাপকের বুদ্ধি অধিকতর বস্তুসচেতন। সে 'রাজা'-কে ভালবাসে; অর্থাৎ প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে তত্ত্বের প্রাচীর গেথে কায়েম করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সত্যানুসন্ধানী মন কালের ইঙ্গিত বুঝতে পারে; সে-ই সকলের আগে বুঝতে পারে "নন্দিনীর রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয় গোধূলির মেঘের মতন দেখাচ্ছে।" সমাজ বিবর্তনের ইশারা অধ্যাপকের নিকট অস্পষ্ট নয়।

রক্ষণশীল মনোভাব আর বুদ্ধিসচেতন মনের মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ সর্দার মহলে সংক্রামিত হয়। তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়; তারা নিজেদের উপর আস্থা হারায়, এবং পরস্পরকে সন্দেহ করতে সুরু করে। সর্দার ও মেজো-সর্দারের পারস্পারিক সম্পর্কে এটা ফুটে উঠেছে। মেজো-সর্দার বুর্জোয়া সমাজের মানবিক চেতনাসম্পন্ন দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ। সে ধনতান্ত্রিক শোষণের উপস্বত্ব ভোগ করে বটে, কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা তার মানবিক চিত্তকে কুণ্ঠিত করে। তার এই কুণ্ঠা দেখে সর্দার শ্লেষভরে বলে: "তোমার রক্তের সঙ্গে দেখছি সর্দারের রক্তের মিল হয়নি।...তোমায় বিশ্বাস করি নে। আমি জানি তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।" অপর পক্ষে ঘনায়মান সংকটের সম্মুখে একদিকে যেমন সর্দার মরিয়া হয়ে এর প্রতিরোধে তার সমস্ত শক্তি ও চাতুরী প্রয়োগ করতে উদ্যত; অন্যদিকে উন্মত্ত ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে সর্দারনীরা ধ্বজাপূজার ভোজ-উৎসবে; নাচওয়ালী, বাজনদার প্রভৃতিকে নিয়ে প্রভূত আয়োজনে তা অভিব্যক্ত। জাতীয় পতাকাকে কেন্দ্র করে যে মহোৎসবের

ব্যবস্থা শক্তিমদমত্ত জাতিদের মধ্যে দেখা যায়, এ যেন তারই নিদর্শক। এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আপামর জনসাধারণ এই সব আয়োজনের দর্শক মাত্র; এতে তাদের কোন অংশ নেই।)

(২)

এ নাটকের স্থান 'যক্ষপুরী'—যাকে অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ "ঐশ্বর্যের দানবপুরী" ব'লে অভিহিত করেছেন: বলেছেন, "যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল।" এই যক্ষপুরীতে কতকগুলি মুনাফাখোর সর্দারের দল নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালনা করছে; এক শ্রেণী ভোগ-ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে আছে, অপর শ্রেণী সারাদিন মেহনত করে মরণের দিকে তিলে তিলে অগ্রসর হচ্ছে,—এদের মাংস-মজ্জা, মন-প্রাণ কিছুই অবশিষ্ট নেই; সর্দারেরা এদের "রাজার এঁটো" বলে তাচ্ছিল্য করে, বলে "যেন আখের মত চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে।" এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা নিরীহ গোবেচারী তাদের সান্ত্বনা গোঁসাই-এর ফাঁকা বুলির মোহ আর তাড়িখানার নেশা; তাদের জন্য মন্দির আর মদের দোকান তাই পাশাপাশি অবস্থিত।

যারা নন্দিনীর সংস্পর্শে এসেছে, রক্তকরবীর জীয়নকাঠির স্পর্শে যাদের মোহনিদ্রা ভেঙে গেছে, তারা আশায় বুক বেঁধে রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করে, অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও বিশ্বাস রেখেছে একদিন মুক্তির পথ খুলে যাবে, একদিন তাদের দুঃখের দিন অবসান হবে। যক্ষপুরী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংকেতিক রূপায়ণ; এর রেখা স্পষ্ট, এর অভিব্যঞ্জনা আদৌ বাষ্পাচ্ছন্ন নয়। কবি আমাদের দেখিয়েছেন এর মর্মান্তিক রূপ নন্দিনীর দৃষ্টি দিয়ে:

"ও-কি? এ সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি! ঐ ত নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের

লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্তি, তাদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। এদের এমন দশা কে করলে? ঐ যে দেখি শকুন্থু, তলোয়ার খেলার সর্দার, আগে পেতো মালা। অনু—প, শকুন্থু—, এইদিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী পাড়ার নন্দিন্! মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ও কি! কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মত ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে।...দুষ্টুমি করে ওকে কতো দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে! হায় রে, আমার ইসারাতে যার রক্ত নেচে উঠতো, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলো না! গেলো গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিভে গেলো।"

এই ছায়ামূর্তির মিছিল ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠল গুঞ্জুব মর্মভেদী আর্তনাদে—যা দেখতে দেখতে রূপান্তরিত হল একটি হিংস্র ক্রোধোন্মত্ত হুঙ্কারে: "সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক দেখলেন নন্দিনীর কপোলে রক্ত-করবীর গুচ্ছ প্রণয়-গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

যক্ষপুরী রবীন্দ্রনাথের নরক-দর্শন, যা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণ করেছে, সার্থক করেছে—যা না দেখলে মহাকবির জীবন-দর্শন কখনও পূর্ণ হয় না। 'ইনফার্ণো' দেখে দান্তে একদিন সার্থক হয়েছিলেন, শেক্স্পীয়রের ট্র্যাজেডি তাঁর জীবনদর্শনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের এ-বর্ণনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; আর এ কোনও বিশেষ একটি ঘটনার বাস্তব চিত্রও নয়। নানা বইয়ে পড়ে এবং নানা জনের নিকট শুনে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা হয়েছিল, এ তারই নির্গলিত রূপ। কিন্তু নরকের প্রবেশদ্বারে মধ্যযুগের মহাকবি দান্তে দেখেছিলেন এক চরম নিষেধ বাণী, "সব আশা-ভরসা ত্যাগ করে এস, তোমরা যারা এর মধ্যে প্রবেশ করতে চাও।" যক্ষপুরীও "একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়", কিন্তু সেটাই কবির শেষ কথা নয়; 'ইনফার্ণো'র পরেও 'প্যারাডিসো' আছে; 'কিং লীয়র'-এর পরে আছে 'দি টেম্পেষ্ট'। আধুনিক কবি পাতালপুরীর

ক্রন্দনের পরেও শুনেছেন যে গান তাতে আছে আকাশভরা খুসী, মাঠভরা পরিতৃপ্তির সুমহান আশ্বাস।

(৩)

এই 'যক্ষপুরী'র কেন্দ্র পুরুষ 'রাজা'। এই 'রাজা' কোনও ব্যক্তি নয়, এ রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক; আসল রাষ্ট্রশক্তি যাদের হস্তগত 'রাজা' তাদেরই হাতিয়ার। যেহেতু এ কোন ব্যক্তি নয়, তাই একে ধরা-ছোঁয়া যায় না; কবির কল্পনায় এক অদ্ভুত জটিল জালের আড়ালে এ প্রচ্ছন্ন। এর অবস্থান কেন্দ্রানুগত, কিন্তু এর শক্তি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। একেই বলে Nation State, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার চরম অভিব্যক্তি—একটি জাতিকে সর্বময় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবার সামগ্রিক আয়োজন যা এই সময়ে মুসোলিনির ফ্যাসিবাদে অভিব্যক্ত হ'তে শুরু হয়েছিল। জাতীয়তাবাদের এই পরিণতি রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ হুমকি ও হুঙ্কারের দাপট দেখে, এবং ১৯১৭ সালে জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত 'Nationalism' সম্পর্কিত তিনটি বক্তৃতায় এর বিপদ সম্বন্ধে জগৎকে অবহিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছিল তা সমসাময়িক ভারতীয় নেতাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে অনায়ত্ত ছিল; তাই অনেকে কবির এই সব বক্তৃতার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি; ভেবেছিলেন বিশ্বমৈত্রীর কল্পনায় বিভোর হয়ে কবি জাতীয় সংহতি স্থাপনের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'নেশ্যান' বলতে এই 'নেশ্যান ষ্টেট'-এরই কল্পনা করেছেন। বলেছেন: " 'নেশ্যান'-এর অর্থ একটি জাতির কোনও যান্ত্রিক উদ্দেশ্যে [অর্থাৎ, মুনাফা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে] রাষ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক সাংগঠনিক রূপ।" এ জাতীয় 'নেশ্যান'কে রবীন্দ্রনাথ একটি বিরাট যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন: "এ যেন একটা বিরাট নিষ্পেষণী যন্ত্র যায় নিষ্পেষণ শক্তি

প্রচণ্ড" ; "যেহেতু এর অপলক দৃষ্টির প্রখরতা যান্ত্রিক, এর বাদবিচার করবার মানবিক ক্ষমতা নেই" ; "এ যেন জীবিত মানুষের ওপর অ-মানুষের অবিচ্ছিন্ন বিরাট মৃতকল্প বোঝা।" এই উপলব্ধিই পরবর্তী কালে 'রক্তকরবী'র 'রাজা'তে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং এই বর্ণনা থেকে আমরা 'রাজা'র নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি,—যার মানবিক চেতনা সম্পূর্ণ বিবেক-বর্জিত, যার নিষ্পেষণে কোনও ছেদ বা বিরাম নেই, যার আছে শুধু শক্তির তাল-ঠোকা আস্ফালন, ক্ষমতার দম্ভ আর সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা। রাষ্ট্রের এ পরিকল্পনা মার্কসবাদে সমর্থিত ; এ যেন "দমন কার্য নির্বাহের জন্য নির্মিত যন্ত্র বিশেষ" (এঙ্গেল্স্) ; "এক শ্রেণী দ্বারা আর এক শ্রেণীর নিষ্পেষণের জাঁতাকল" (লেনিন)। পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের এই মার্কস্‌বাদী সংজ্ঞা সমর্থন করে কবি তাঁর উদ্দেশ্যকে যেন আরও ফুটিয়ে তুলেছেন।

(৪)

এই নিষ্পেষণী যন্ত্রের বিরামহীন সক্রিয়তা পরশ্রমজীবী সর্দার-গোষ্ঠীকে ঐশ্বর্যে ও ক্ষমতায় দিন দিন স্ফীতকায় করে ; আর মেহনতী কারিগরদের ক্রমশঃ হীনমনা ও ক্ষীণবীর্য করে শুধু টিকে থাকবার মতন জীবনীশক্তি অবশিষ্ট রাখে, যার ফলে এদের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত, ইচ্ছাশক্তি মুমূর্ষু, চিত্ত দ্বিধা ও সন্দেহে উৎক্ষিপ্ত। এদের মধ্যে নন্দিনী এসে দেখল, "এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় দেখাচ্ছে।" সর্দারদের কাছে এই সব লোক "মানুষ নয়, শুধু সংখ্যা।" এদের "ঠাস দাসত্বে" "না আছে আশা না আছে অবকাশ"। এদের মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করতে সব রকম পন্থা সর্দারেরা অবলম্বন করেছে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই এদের জন্য মদের ভাণ্ডার, অস্ত্রশালা আর পূজার মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে। এদের চেতনার স্বচ্ছ মুহূর্তগুলিকে

মোহাবিষ্ট করবার প্রয়োজনে গোঁসাইকে মোতায়েম রাখা হয়েছে ঃ তার মুখের বুলি, "আশীর্বাদ করি সর্বদা অবিচলিত থাক; তাহলে ঠাকুরের দয়াও তোমাদের উপর অবিচলিত থাকবে।" শুনে মূঢ়েরা ভক্তি-গদগদ চিত্তে তার পায়ের ধুলো মাথায় নেয়। এই যে সরল কারিগরদের বিভ্রান্ত করবার, লক্ষ্যচ্যুত করবার, ধর্মের মৌতাতে তাদের স্বাধীন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করবার নিশ্ছিদ্র আয়োজন, বুর্জোয়া সমাজে এর বাস্তবানুগতি কে অস্বীকার করবে? এই সব ব্যবস্থার চরম ও একমাত্র লক্ষ্য যাতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদের মন থেকে প্রতিবাদের ইচ্ছা পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়। গজ্জু পালোয়ান বলছে, "সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করে ওরা নিশ্চিন্ত হবে।...ওরা কোথাকার দানব, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।" এদের উপর মানসিক জবরদস্তি ও শারীরিক অত্যাচার একসাথে চলে। গোকুল-চন্দ্রার মতো মোহাচ্ছন্নদের জন্য আছে প্রভুপাদের বাণী; আর যারা বিদ্রোহী তাদের জন্য আছে চরম শাস্তি,—কিশোরের বিরুদ্ধে ডালকুত্তা লেলিয়ে দেয়, বিশুপাগলাকে চাবুক দিয়ে মারে। কিন্তু দুইয়েরই উৎপত্তিস্থল এক; প্রয়োজনবিশেষে কূর্ম অবতারই বরাহ অবতারে পরিণত হয়ঃ "যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে, তারই রশি দিয়ে, গোঁসাইয়ের জপের মালা তৈরী"। এই শ্লেষাত্মক শাণিত ভাষা মর্মান্তিক হয়ে ওঠে ঘটনার পরিপ্রেক্ষণীতে।

(৫)

এই ধরণের রোষকষায়িত ভাষা রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর আর কোনও রচনায় ব্যবহার করেননি তা নয়। যেখানেই তাঁর মানবিক চেতনা আহত হয়েছে, তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু অন্যত্র একটা আন্তরিক শালীনতাবোধ এই প্রকার অনুভবের উগ্রতাকে প্রশমিত করেছে; ভাষার মধ্যে এনে দিয়েছে ভব্যতার সংযম; রূঢ় সত্য স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা অপেক্ষা আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করার দিকেই

তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু সভ্যতার উদীয়মান সংকট যখন মানুষের মনুষ্যত্বকে নিংড়ে নিংড়ে বের করে নিয়ে তার পাশবিক প্রবৃত্তির নির্লজ্জতাকে অনবগুণ্ঠিত করে, মাত্র তখনই তাঁর এই উগ্র স্পষ্ট ভাষা তাঁর সুগভীর মানসিক বেদনাকে আমাদের সামনে স্পষ্টতর করে দেয়। 'রক্তকরবী'র বিশেষত্ব এইখানে: শ্রেণী-সংগ্রামের পটভূমিকায় এই ধরনের উক্তির একত্রিত সমাবেশ, চকমকির ঠোকাঠুকিতে নির্গত আগুনের ফুল্‌কির মত, এর অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রোজ্জ্বল করে, তার বিপ্লবাত্মক তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তোলে। এখানে কোনও ভাববাদী ঐতিহ্যের মধ্যস্থতায় মনের উত্তাপকে নির্বাণোন্মুখ করবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই। একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মনোভাব নাটকে আমদানি হয়েছে—যা নিপীড়িত নীচের তলার মানুষের মনের চাপা আগুন গুমরোতে গুমরোতে হঠাৎ বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ল গজ্জু পালোয়ানের হিংস্র গর্জনে, "হে কল্যাণময় হরি,—আঃ যদি একবার—তোমার দয়া হলে কি না হতে পারে—সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি, একদিন যেন ওর চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলে যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।" এখানে ধর্মীয় উপদেশের মৌতাতে হিংসাকে প্রশমিত করবার জন্য কোনও ধনঞ্জয় বৈরাগীর আবির্ভাব ঘটেনি। এই নগ্ন জিঘাংসার সুর রবীন্দ্রসাহিত্যে একেবারে নূতন এ ভাঙনের গানের সুর,—বুকে চমক লাগায়, রক্তে দেয় দোলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নন্দিনী, 'রক্তকরবী,' রঞ্জন

(১)

যক্ষপুরীর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে 'নন্দিনী' বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মতন সর্বত্র বিচরণ করছে। নন্দিনীর পরিচয় পূর্ণ হয় তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন পার্শ্ব চরিত্রের মন্তব্যে। সে সকলের "মনের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয়"। "তার রক্ত আভায় একটা ভয়-জাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়"। ভীরুর কাছে "সে যেন রাঙা আলোর মশাল, —বলছে 'সাবধান, সাবধান'। বীরের মন থেকে হতাশা দূর করে সে আলোর সন্ধান দেয়। তার মুখে চোখে প্রাণের লীলা। আর পিছনে কালোচুলের ধারা, মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা"। সে "ইন্দ্রদেবের আগুন", এসেছে ভাঙতে "সর্দারের সোনার চূড়া"।

রবীন্দ্রনাথ তাকে সামান্য মানবীকন্যা বলেছেন, যেহেতু তার প্রাণে আনন্দের দীপ্তি আছে, মনে করুণার স্পর্শ আছে। কিন্তু এ-যে তার পূর্ণ পরিচয় নয়, বোঝা যায় তার চরিত্রে সাধারণ নারীসুলভ প্রবণতার অভাবে। তার প্রেমানুরাগে আবেগ আছে, অভিমান নেই; আকুলতা আছে, আসক্তি নেই। রঞ্জনের প্রতি তার আকর্ষণের অন্তরালে আছে কোনও মহৎ আদর্শের জন্য চরম আত্মাহুতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। মোটের উপর তার সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত লঘু, সেই জন্য সাধারণ নারী চন্দ্রা তাকে বুঝতে পারে না, সন্দেহ করে। তার চরিত্রের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে, সে তার আত্মনিষ্ঠ সজীব মননশীলতা, যার সংস্পর্শে যে-ই আসে তারই মন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

(আসলে নন্দিনীর চরিত্র সাঙ্কেতিক।) এইখানে অন্য চরিত্রের সঙ্গে তার প্রভেদ। অন্য চরিত্রগুলি প্রতীকী, সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধি। কিন্তু নন্দিনীর চরিত্রে সেই ইসারা পরিব্যাপ্ত, যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণসঞ্চার করে, জীবনীশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। অর্থাৎ

নন্দিনী মানুষের জাগ্রত চিৎশক্তির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, যা আমাদের শিরায় শিরায় পুলক জাগায়, যা জীবনের বন্ধুর পথে বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে মনের অগ্রগামিতাকে অব্যাহত রাখে। এর সন্ধান রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়ে গেছেন। বলেছেন, "নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান [যক্ষপুরী] থেকে নির্বাসিত।... এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল।" প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর—"চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।" যে মুহূর্তে সমাজের সমতালীয় গতিবেগে অসমতা বা অসঙ্গতি দেখা যায়, এই সক্রিয় চিৎশক্তি এনে দেয় বিপ্লবের দ্রুত ছন্দ, যার ফলে পিছুটানের শিকল কেটে যায়, রাষ্ট্রশাসনের বাঁধন খুলে যায়,—আনে নবজীবনের প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস। [নন্দিনী 'মানবী-কন্যা' শুধু এই অর্থে যে, মানুষের অন্তরে তার জন্ম, মানুষের অনুরাগে সে লালিত, এবং মানুষের মনকে সে দীপান্বিত করে তার শক্তির উজ্জ্বল দীপ্তিতে। সে যেখানে যায় নিয়ে যায় প্রাণের তরঙ্গ; সমস্ত পরিবেশ তার আগমনে চঞ্চল হয়ে ওঠে; তাকে অপছন্দ করা সম্ভব, উপেক্ষা করা অসম্ভব।

চিৎশক্তির দুটো দিক আছে। একদিকে সে রসজ্ঞ; জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপভোগ করবার জন্য উন্মুখ। অপর দিকে সে ভাবজ্ঞ, চেতনার সাহায্যে সে জানবার প্রয়াসী; পর্যায়ক্রমে উন্মেষিত নবজীবনের রহস্য-সন্ধানে তার সমস্ত শক্তি অনর্গলিত। তাই সে যেমন রস সৃষ্টি করে, তেমনি মনের মধ্যে কৌতূহল সঞ্চার করে। সে মায়াবিনী, বীরকে ভাবাবিষ্ট করে, অনুপ্রাণিত করে; সে বীর্যবতী, ভীরুকে ধিক্কার দেয়। এক কথায় নন্দিনী মনের সেই সঞ্জীবনী শক্তি যা মানুষের মননশীলতাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমান থেকে মানুষকে উদ্ধার করে, এবং সাহিত্যে-শিল্পে নবচেতনা জাগিয়ে দিয়ে আমাদের নিত্যসম্মুখগামী চলার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। এই জন্য যক্ষপুরীর সর্বত্র তার অবাধ গতি; সে সর্দারদের

ভয় করে না, রাজার দ্বারপ্রান্তে বারবার ঘা দেয়, খোদাইকারদের উৎসাহিত করে।) রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এই জাগ্রত চিৎশক্তির পূজারী; এরই উদ্দেশে তিনি 'বলাকা'য় লিখেছিলেন তাঁর অপূর্ব ভাববিমূর্ত ভাষায়:

বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ----
দেখে না যে বান ডেকেছে,
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।
আয় অশান্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, এ কী বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।

(তাই নন্দিনী বিশুর "স্বপন তরীর নেয়ে",— "শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় যে রঙীন করে"। সে 'ঘুম-ভাঙানিয়া', 'দুখ-জাগানিয়া', চমক দিয়ে যখন ডাক দেয়, তখন "আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো"। নন্দিনীচরিত্রের এইসব নির্ভুল সংকেত গূঢ় হলেও নাটকের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

(২)

নন্দিনীকে যদি মানুষের এই ঘুম-ভাঙানিয়া প্রাণশক্তি বলে মনে করা হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে, "এখানকার রাজা খামকা ওকে আনল

কেন ?" কোন্ শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে সে এই যক্ষপুরীতে আমন্ত্রিত হল ? মনে রাখতে হবে,জাগ্রত চেতনাকে জড়ত্বে পরিণত করা, সচেতন মানুষকে অচেতন যন্ত্রে পরিণত করা, শাসক-গোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থ। রবীন্দ্রনাথের এ কল্পনা একান্ত ইতিহাস সমর্থিত। মানুষের মুক্ত মন সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের শত্রু। সেইজন্য রাষ্ট্রশক্তি এই কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণে সাধ্যমত মানুষের মননশীলতাকে নিযুক্ত করতে চায়, নিজেদের সংকীর্ণ প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়। এই মননশীলতার স্বাধীন প্রকাশ সাহিত্যে, শিল্পে, স্বাধীন চিন্তায়। তাই বৈপ্লবিক আদর্শ ও ভাবধারা এই পথেই চিরদিন সমাজে প্রবেশ করে, চিন্তায় বিপর্যয় ঘটায়। ইংরাজ কবি শেলী তাঁর 'কাব্যের স্বপক্ষ সমর্থনে' শীর্ষক বিখ্যাত আলোচনায় কবির এই ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন :

"যে যুগে ও জাতির মধ্যে কবির আবির্ভাব হয়, তার অবস্থা অনুসারে, তাঁকে যুগস্রষ্টা বা ক্রান্তদ্রষ্টা বলা হয়। বস্তুত কবির মধ্যে এই দ্বিবিধ শক্তির সম্মিলিত প্রকাশ দেখা যায়। কারণ তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি শুধু যে বর্তমানের সীমার মধ্যে আবদ্ধ তা নয় ; শুধু যে কালোপযোগী বিধানের আবিষ্কর্তা তা-ও নয় ; তিনি ভাবীকালকে বর্তমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, এবং তাঁর চিত্তে আগামী কালের বীজ পুষ্পিত ও ফলবন্ত হয়"।

কবির এই কালাক্রান্তিক সৃজনীশক্তিই তাঁকে সমাজে বিশিষ্ট স্থান দেয় ; নিজে কর্মজগতে নেতৃত্ব গ্রহণে অক্ষম হলেও, ভাবজগতে তাঁর প্রভাব প্রলয়ঙ্কর হতে পারে। তাই ভূতগ্রস্ত রাষ্ট্রনায়কগণ যে-হেতু মনে করেন ভাবই কর্মের উৎস, ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে নিরাপদ করতে চেষ্টা করে।

'রক্তকরবী'র অন্তরে যে ভাবীকালের সম্ভাবনা অবস্থিত, সেটা রঞ্জনের আত্মপ্রকাশকে ঘিরে। এই সম্ভাবনা সর্দারদের সন্ত্রস্ত করে, এবং রাজার সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত। নন্দিনী রঞ্জনের অগ্রদূত ; সে সর্বত্র তার আগমনের বার্তা ঘোষণা করছে। অতএব নন্দিনীকে যদি

যক্ষপুরীর গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায়, তার গতিবিধি কিয়ৎপরিমাণে সংযমিত করা যায়, এমন কি তাকে যদি প্রলোভনে ও আদর-আপ্যায়নে ক্রমশঃ দলভুক্ত করা যায়, তাহলে রাষ্ট্রের তথা সমাজ-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা থাকে না। নাটকের এই ইঙ্গিত অভ্রান্ত। যুগে যুগে রাষ্ট্র চেয়েছে কবির সহকারিতা, কারণ মানবজাতির চেতনার উপর কবির আধিপত্য। তাই ত সব দেশে ও সর্বকালে রাষ্ট্রশক্তি মানুষের চিন্তাকে, চেতনাকে সর্বতোভাবে বিপ্লববিমুখ করবার চেষ্টা করে,—যে জন্য অস্তিত্ববাদ, অধ্যাত্মবাদ, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি বাস্তববিমুখ তত্ত্বের পরিপোষণে রাষ্ট্রের উৎসাহের অন্ত নেই।* অতএব রাজা ও সর্দার—রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদীরা যে কারণে অধ্যাপক-পুরাণবাগীশকে যক্ষপুরীতে এনেছে, নন্দিনীকে এনেছে ঠিক একই কারণে। সমাজে এদের প্রত্যেকের একটি বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিই : অধ্যাপকের কাজ শুধু বস্তুকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা, যা জ্ঞানকৈবল্যের পরিচায়ক; তার জানবার ও বোঝবার আগ্রহের অন্ত নেই, কিন্তু কর্মের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই, কর্ম থেকে নিবৃত্তিই তার সাধনা। গোঁসাই ধর্মের বুলি আউড়ে চেতনাকে স্তিমিত করে, মুক্তিস্পৃহাকে বিলুপ্ত করে। পুরাণবাগীশ পুরাতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। এদের সকলের উদ্দেশ্য এক : একটা মনগড়া জগৎ রচনা করে, সাধারণ মানুষের বিকৃত ও খণ্ডিত সমাজ-জীবনের নগ্ন রূপকে গোপন করে রাখা।

নন্দিনীকে এই কাজে লাগাতে চেষ্টা হয়েছিল; তার আভাস পাওয়া যায় নন্দিনীকে রাজার প্রশ্নে, "আমার শক্তিতে তুমি খুসী নও, নন্দিনী?" নন্দিনীকে খুশী না করলে ত সমূহ বিপদ।

*বিপ্লবাত্মক সমাজে রাষ্ট্রে এর বিপরীত নীতি অনুসৃত হয়। সেখানে এই সব প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শকে কোনও রকম প্রশ্রয় দেওয়া হয় না প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কায়।

কিন্তু তা সম্ভব হ'ল না, কারণ মোহমুক্ত চেতনাকে কোনও মতেই বাগে আনা যায় না। তাকে বিশ্লেষণ ক'রে অধ্যাপক বলছে, "এই যক্ষপুরীতে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাস আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে, কিন্তু ও একেবারে বেখাপ।" কিন্তু যদিও নন্দিনী যক্ষপুরীর ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায়নি, সে তার পরিবেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে আছে। সে এই পরিবেশ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে, আবার এই পরিবেশেরই রূপ বদলে দিতে চেষ্টা করে। সমাজের মধ্যে এই পারস্পরিক প্রভাব-বিনিময় সাহিত্যসৃষ্টির মূলে অবস্থিত। পরিবেশ যেমন কবি-মানসকে নিয়ন্ত্রিত করে, রূপান্তরিত করে, কবিও তেমন তাঁর মানস-সৃষ্টি দ্বারা পরিবেশকে প্রভাবিত করে, পরিবর্তিত করে। নন্দিনীর এই বাস্তব পরিকল্পনায় আমরা সমাজে কবি ও শিল্পীর ভূমিকার পরিচয় পাই।

(৩)

নন্দিনীর প্রভাব সবচেয়ে বেশী কাজ করে তাদের উপর যারা অন্যায় অত্যাচারের প্রপীড়নে বর্তমান অবস্থার প্রতি বিদ্বিষ্ট, যাদের মন নবচেতনার অভ্যুদয়ে ভয় পায় না:—যেমন, অকুতোভয়বীর বালক কিশোর, যে "বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে মুক্তি চায়", হাতকড়ার বন্ধনকে প্রকৃত অবস্থার পরিচায়ক জেনে বেপরোয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হেসে উঠে; যেমন গজ্জু পালোয়ান, যে মুমূর্ষু অবস্থায় এক দিনের জন্যেও জোর কামনা করে "কেবল ঐ সর্দারটার ঘার মটকে দেবার জন্য"; যেমন ফাগুলাল,—এমনিতে শান্তিপ্রিয় ও সরল সংসারী মানুষ, কিন্তু সংকটের মুহূর্তে অত্যাচারে জর্জরিত যক্ষপুরীতে বারুদের মতো ফেটে পড়ে বিদ্রোহের আওয়াজ তোলে, "বন্দীশালা ভেঙ্গে চুরমার" করে দেবার জন্য, এগিয়ে যায়' মরণ-সংগ্রামে নির্ভীক বীরের

মতন। আর যবনিকার অন্তরালে আছে রঞ্জন,—সে তলায় তলায় প্রস্তুতি পর্ব চালিয়ে যায়; আরম্ভে যার উড়ো খবর আসে 'বসন্তের গানে বাতাসের লীলায়', অবসানে যার রক্তের রেখা মুক্তির পথে রেখে যায় সাফল্যের আসন্ন বিজয় সংবাদ।

এই সব মুক্তিকামী প্রগতিমনা অজানা অখ্যাত বীরের মধ্যে নন্দিনী আশা সঞ্চার করে, শক্তি যোগায়। বিদ্রোহী বীর কিশোর তার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে রক্তকরবীর গুচ্ছ এনে দেয় তার হাতে; জানোয়ারদের ভয়ে তাকে বারণ করলে সে বলে ওঠে, "একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব, নন্দিনী, এ কথা কতবার মনে মনে ভাবি।" ভাবে বিভোর বেপরোয়া বিশু বলে, "যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতোকাল মনে হতো জীবন হতে আমার আকাশখানি হারিয়ে ফেলেছি। মনে হতো এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। এর মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময়ে তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে।" মানব-সমাজে সাহিত্য-শিল্পের এই ত প্রকৃত ভূমিকা—তমসাচ্ছন্ন মনে আশার আনন্দের আলোকবর্তিকা জ্বেলে দেওয়া।

অবশ্য যাদের মন সংস্কারে আবদ্ধ, গতানুগতিকের মরচে-পড়া জঙ-ধরা চাকায় বাঁধা—যেমন গোকুল, চন্দ্রা,—তারা নন্দিনীকে দেখে ভয় পায়, সন্দেহ করে, মাঝে মাঝে তার প্রতি হিংস্র মারমুখো হয়ে ওঠে। এরা বাস্তবকে ভুলে একটা মায়ার জগতে শান্তি পেতে চায়; নন্দিনী এদের সেই মনগড়া নেশায়-পাওয়া শান্তি নষ্ট করে,—তাকে সহ্য করা বা ক্ষমা করা এদের পক্ষে অসম্ভব। জনসাধারণের মধ্যে এই দুই শ্রেণীর লোক-চরিত্র কবি অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই নাটকে অপ্রধান চরিত্রের প্রযোজনায় কিছুটা

অভিনবত্ব আছে। সাধারণ নাট্য-প্রকরণে এই সব চরিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করবার এবং বৈচিত্র্য আনবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই নাটকে এরা প্রধান চরিত্রের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে,—'বিশিষ্ট সাধারণ' এবং 'সর্বসাধারণের' মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এখানে আগামীকালের লোকনাট্যের আঙ্গিক সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য নজির রেখে গেছেন। এরা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে না বটে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত করে তোলে। ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আরিষ্টট্‌ল্ কি এই কথাই বলেন নি?

(৪)

নন্দিনীর হাতে আছে রক্তকরবী, তার মনে আছে রঞ্জনের মায়া। রক্তকরবী সেই শক্তির প্রতীক নন্দিনী যার মন্ত্রসাধিকা। নাটকের আগাগোড়া রক্তকরবীর লাল রঙে সমুজ্জ্বল। এইখানে নাটকের নামকরণের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নাটকের নাম 'যক্ষপুরী' রেখেছিলেন; তাতে বাইরের রূঢ় পরিবেশ সপ্রকাশ, কিন্তু অন্তরের সত্য প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। নন্দিনীর নামে নামকরণও তাঁর মনঃপূত হয়নি কারণ তাতে নাটকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তার বিপ্লবাত্মক ব্যঞ্জনা অব্যক্ত থেকে যায়। কেন 'রক্তকরবী' নাম নির্বাচন করলেন, এ সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহন সেন একখানি পত্রে প্রমথনাথ বিশী মহাশয়কে ব্যাখ্যা করেছেন: নাটক বোঝবার পক্ষে এ ব্যাখ্যা অপরিহার্য।

"মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে একদিন কথা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন, 'দেখুন, প্রাণের জন্য ভয় নেই। উপনিষদ্ বলেন, প্রাণই সত্য, তার মৃত্যু নেই। ভয় ছিল জড়ের জন্য। বিজ্ঞান বলছেন, প্রকৃতির হাতে যে বস্তু তারও মৃত্যু নেই। মরে যত সব মানুষের রচিত কৃত্রিম বস্তু। 'রক্তকরবী'-তে আমি সে কথা বলেছি। হাজার বাঁধন বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও তাকে কে মারতে পেরেছে? আমার ঘরের কাছে একটা লোহা-লক্কড় জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে ছোট্ট একটা রক্তকরবী গাছ চাপা পড়েছিল।...কিছুদিন

পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জাল-জঞ্জাল ভেদ করে একটি সুকুমার করবী শাখা উঠেছে, একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এলো।··· নাটকটিকে তাই 'যক্ষপুরী', 'নন্দিনী' বলে আমার মন তৃপ্ত হয় নি। তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী"।"

এই উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত। অর্থাৎ কবি বলতে চাইছেন সমস্ত অত্যাচারের আবর্জনা উপেক্ষা করে মানুষের প্রাণশক্তি আত্মপ্রকাশ করে আপন মহিমায়। 'নন্দিনী' অর্থাৎ চিৎ-শক্তির স্পর্শে প্রাণ জেগে উঠে, দৃপ্তভঙ্গিতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়; তার আরাম-বিরামের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়; এই বলিষ্ঠ বিদ্রোহাত্মক সংগ্রামে মন জর্জরিত হয়, দেহ রক্তাক্ত হয়; কিন্তু তবু সে অদমনীয়। তাই রক্তকরবীর লাল রঙের ভয়ে যক্ষপুরীর সর্দার-মহল আতঙ্কিত। মুখে আস্ফালন করে, কিন্তু বুকে আশঙ্কা বোঝা হয়ে চেপে থাকে; কেবলই সন্দেহ বুঝি এই জিয়নকাঠির স্পর্শে মরা মানুষ-গুলো আবার আশার আনন্দে জেগে উঠবে।

তাই নন্দিনীর রক্তকরবী চাই-ই; কিশোর এই রক্তকরবী আবিষ্কার করে আনতে বদ্ধপরিকর; সঙ্কটের আসন্ন মুহূর্তে অধ্যাপক দেখে সেই রক্তকরবীর গুচ্ছ নন্দিনীর কপোলে "প্রলয় গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে"। বিদায়ক্ষণে সে নিজেকে রিক্ত করে দিয়ে গেল তার রক্তকরবীর কঙ্কন অনুগামীদের হাতে। বলে গেল তাদের কানে কানে—

ভয় নাই ওরে ভয় নাই।

(৫)

যক্ষপুরীতে নন্দিনীর জীবনে সব চেয়ে বড় কথা সে সারাক্ষণ রঞ্জনের আগমন প্রতীক্ষা করছে; সর্বদা উদ্‌গ্রীব হয়ে সকলের কাছে সেই শুভ মুহূর্তের তত্ত্ব-তল্লাস করছে। নন্দিনীর মধ্যে যেমন মননশীল

মানুষের প্রাণবস্তু বিমূর্ত, রঞ্জন তেমনি কর্মজগতের অনুপ্রেরণা, অসাধ্য সাধনে সে উৎসর্গীকৃত। আদর্শের উদ্দীপনায় মানুষের মন আশার বর্ণানুলেপনে রঞ্জিত হয়,—তাই সে রঞ্জন। সে সেই দুর্লভ বাছাই-করা আদর্শবাদী কর্মবীরের দলে যারা তলায় তলায় কাজ করে, যারা হুজুরদের হুমকীতে ভয় পায় না, যাদের কারাগারে বন্দী করা যায় না,—গারদের ভিৎ কেটে বেরিয়ে আসে। এরা বিপ্লবের অগ্রদূত, দেশে দেশে এদের বারতা ইতিহাসের মরাপাতাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। সর্দারের ঘৃণিত চর মোড়ল সখেদে বলছে, "ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি কেমন করে ও পিছলে বেরিয়ে এসেছে।···ও কথায় কথায় সাজ বদল ক'রে, চেহারা বদল করে।" পুনরায়—"আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।" মহা আতঙ্কে বলছে, "দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে।" নাটকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সব টুকরো কথার ইঙ্গিত অনুসরণ করলে সহজেই বোঝা যায় বৈপ্লবিক আন্দোলনে রঞ্জনের স্থান কোথায়। ঐ ধরণের চরিত্রকে একটা 'আইডিয়া'য় পরিণত করা অবাস্তব।

রঞ্জনের চরিত্র-রূপায়ণ সম্পূর্ণতা লাভ করেছে নন্দিনার বর্ণনায়। নন্দিনী বলছে, "ও যেমন হাসতে জানে তেমনি ভাঙতেও জানে।" নন্দিনী যেমন মুক্ত মানুষের মনে আনন্দ জাগিয়ে তোলে, রঞ্জন তেমনি সেই আনন্দের জোয়ারে তাকে কর্মস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই নন্দিনী যদিও সব মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় সে একমাত্র রঞ্জনের সঙ্গে মিলন কামনা করে। সে আকাশে-বাতাসে রঞ্জন আসছে শুনে আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। তার কথা শুনে অধ্যাপক বলে, "রঞ্জনের কথা হলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না।" অসাধারণ বিদ্রোহী বীরকে দেখলে মানুষের চেতনা বিস্ময়ে আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে; তখন তার সম্বন্ধে সাধারণ কথাও হয়ে পড়ে কাব্য। তাই নন্দিনী যখন রঞ্জনের কথা বলে তার ভাষায় ধ্বনিত হয় কাব্যের আবেগ-স্পন্দন

উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, 'দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে সে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতে আমাকে জিতে নিয়েছে।" পার্শ্ব-চরিত্রদের মুখে রঞ্জন সম্বন্ধে এই সব বাক্যের সঙ্কেত অনুধাবন করলে যে মানবিক-চরিত্র আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই তার সত্যকারের পরিচয়।

রঞ্জনের আভাস সারা নাটকটি ছেয়ে আছে, কিন্তু সে সব কিছু করে অন্তরাল থেকে। সে এক বিপদসঙ্কুল গোপন পথে নির্ভীক পথিক। সেই পথে নন্দিনী যেমন তার উদ্দীপিকা, সেও তেমনি নন্দিনীর জীবনে অচঞ্চল আলো-বর্তিকা। অধ্যাপক বলে, "একা নন্দিনীকে নিয়ে যক্ষপুরীর সর্দারেরা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কি?" তাই সর্দারের দল এদের মিলনে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। এদের যুগ্মসাধনা যক্ষপুরীর আলোহীন, আশাহীন নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের দম-আটকানো আবহাওয়ায় শ্রমিকদের মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চার করে; নিরীহ ফাগুলালকেও উন্মত্ত করে তোলে, সে হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, "মিছে বকাবকি করে কি হবে? কারিগরের পাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব।" এই ধ্বনিই শোনা গিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রাঙ্গণে, রুশ বিপ্লবের প্রারম্ভে। বিদ্রোহী জনতার ক্রোধোন্মত্ততা সংযত করবার জন্য এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ কোনও অভিজিৎ-ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

(৬)

সমাজবিবর্তনের গতি শ্রেণী-সংগ্রামকে ক্রমশঃ বেগবান করে। এর ফলে শ্রেণী সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটে। যেমন একটা শ্রেণী বিলুপ্তির দিকে ক্রমশঃ অস্তমিত হয়, তেমনি অন্যটি দিনে দিনে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে বিকশিত হয়। 'রক্তকরবী'তে দেখি একদিকে সঙ্কটাকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে 'বিশিষ্ট সাধারণের' অবক্ষয়; অপরদিকে দেখি সর্বসাধারণের বিজয় সম্ভাবনার পূর্বাভাস। যক্ষপুরীর রাজা এই ক্ষীয়মাণ বিশিষ্ট সাধারণের স্বার্থসংরক্ষক : ধনতান্ত্রিকসমাজে রাষ্ট্রশক্তি, শোষক শ্রেণীর করায়ত্ত নিষ্পেষণী যন্ত্র একথা পূর্বে বলেছি। এ রাষ্ট্রশক্তি নন্দিনীর প্রাণপ্রাচুর্যে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে নিজের অবসানের বারতা পেয়ে মনে একটা অনভ্যস্ত ত্রাসও অনুভব করে। সে নন্দিনীকে বলে, "সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্না।" মনের এই দোটানায় গণচেতনার বিভিন্ন স্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে তার অনন্যমন্যতায় সংশয় নিয়ে আসে; বজ্রসুকঠিন রাজশক্তির বাঁধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে। এই অবস্থায় নন্দিনীর প্রতি তার প্রশ্রয়ের ভাব দেখা যায়। এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে সর্দার ও মেজো-সর্দারের মধ্যে মতদ্বৈধ। সর্দারের কাছে নন্দিনীর উদ্দেশ্য স্পষ্ট; সে বুঝতে পেরে বলে, "যারা একদিন কীটের মতো মাটিতে গর্ত করে চলেছিল, তাদের আজকে মরবার পাখা মিলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। তারপর শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশী দেরী নেই।" এই সংগ্রামের আসন্নতায় ক্ষিপ্ত হয়ে সে যখন চর-অনুচরকে লাগিয়ে দিল প্রতিশোধের ব্যবস্থা রচনার কাজে, দেখা গেল মেজোসর্দার তা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, "না না, এ সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে মোড়লের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনও রকম নোংরামোকে ভয় করে

না।" উত্তরে সর্দার বিরক্তির সুরে বলছে, "তোমাকে বিশ্বাস করিনে। আমি জানি তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।" উপর-তলার মানুষের মনে এই দ্বিধা রাজার মানসিক চাঞ্চল্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সর্দারের ক্রোধে কর্তব্যের রঙের সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীর রক্তকরবীর রং মিশে গিয়ে আসন্ন বিপ্লবের রক্তিমাকে ভয়ঙ্কর করে তোলে। একদিন যা ছিল রক্ত আভা, নাটকের অবসানে তা রক্তরেখায় মিশিয়ে গেল।

এই তত্ত্বে একটা প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাবে। রাষ্ট্র তো একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্ত্বা, কিন্তু নন্দিনীর সঙ্গে তার ঘাত-প্রতিঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণের মানবিক সম্বন্ধের তাৎপর্য এইখানে। কবির এ কল্পনা মোটেই অবাস্তব নয়, কারণ রাষ্ট্র নৈর্ব্যক্তিক হলেও ব্যক্তিমানসের মধ্যেই তার অস্তিত্ব, ব্যক্তির কার্যকলাপেই সে আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে মানুষ যেমন সংস্থার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে তার আত্মসত্তা হারায়, তেমনি যে-কোনও সংস্থা মানুষের মধ্যেই সক্রিয় ও পরিবর্তনশীল হয়ে ওঠে। তাই রাষ্ট্র নৈর্ব্যক্তিক হলেও সে ব্যক্তির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়। রাজার প্রতি নন্দিনীর নিত্য-পরিবর্তনশীল সম্পর্কের মাধ্যমে কবি এই জটিল সামাজিক সত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

(৭)

এই বিপ্লবাত্মক তাৎপর্যকে কিছু পরিমাণে অন্তরালে রাখবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ সঙ্কেতের আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন, এ-কথা আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হলেও অর্দ্ধসত্য মাত্র। শিল্পী বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ আঙ্গিক বা রীতি নির্বাচন করেন প্রধানতঃ ভাবপ্রকাশের পূর্ণরূপায়ণের প্রয়োজনে। এ প্রয়োজন শিল্পঘটিত, স্বার্থঘটিত কখনও নয়। যেখানে রচনার বিষয়বস্তু ব্যক্তি-চরিত্র বা বিশেষ ঘটনা, সেখানে প্রচলিত নাট্যরীতি পর্যাপ্ত। সীমারেখার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে যা অবধৃত, তার প্রকাশে সীমান্তিক রীতিই

প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে অর্থের ইঙ্গিত বিশেষকে অতিক্রম করে নির্বিশেষের পর্যায় পৌঁছেছে, সেখানে রূপকই প্রকৃষ্ট আঙ্গিক। 'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক সমস্যা ছিল একটা সভ্যতার যুগপরিব্যাপ্তির প্রকাশ, এবং সে প্রকাশ বিশিষ্ট মানুষের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে। মানবাত্মার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, অন্তরব্যঞ্জক (Impressionist) নাটকে যুগসত্তা অপ্রকাশ থেকে যায়। আবার অভিব্যঞ্জক (Expressionist) নাটকের মতো যদি যুগসত্তার উপর জোর দেওয়া হয়, তাহলে মানবাত্মার আবেদন ঝাপসা হয়ে যায়। গত পঞ্চাশ বৎসরে পাশ্চাত্য দেশে এই উভয় রীতির প্রয়োগ নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। রবীন্দ্রনাথও এ নিয়ে সারা জীবন নাড়া-চাড়া করেছেন। 'রক্তকরবী'তে এই দুটি রীতির সংমিশ্রণ-চেষ্টা নাট্যপ্রকরণের দিক থেকে যথেষ্ট মৌলিকতা দাবী করে। যারা শ্রেণী-অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-মানুষ, তাদের চরিত্রে ও কথায় বস্তু-সত্য সুপ্রকট। যেখানে ভাষা প্রহেলিকাময়, সেখানে বক্তার নিজের মন বিভ্রান্ত, জটিল অবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য তার চোখে অস্পষ্ট। তারা কোনও ব্যক্তি-মানুষের নামাঙ্কিত নয়,—যেমন রাজা, সর্দার, মোড়ল, অধ্যাপক:—তারা ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে প্রতীকী মানুষে পরিণত হয়েছে। আর এদের মধ্যে বিচরণ করছে নন্দিনী: সে এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র; উভয়ের সম্পর্কে রূপান্তর আনবার বৈদ্যুতিক শক্তি।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'রক্তকরবী'র রাজা ও রাষ্ট্রবিপ্লব

(১)

যদিও 'মুক্তধারা'র মতো 'রক্তকরবী'ও একটা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে, তবুও দুটি নাটকের মধ্যে একটি মৌলিক ভিন্নতা দেখা যায়। 'মুক্তধারা'য় বিপর্যয় ডেকে এনেছে একজন বীরের আত্মবলিদানে। কিন্তু এই নাটকে আমরা একটা গণ-অভ্যুত্থানের পরিচয় পাই,—যাকে বলা যায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের অপ্রতিরোধনীয় পরিণতি। এই দ্বন্দ্ব সহসা আত্মপ্রকাশ করেনি; এর পশ্চাতে দীর্ঘ-দিনের প্রস্তুতি ছিল, এবং তার কোনও পর্যায়ে কোনও সময়ে কোথাও আপোষের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। হয়-ত বিভিন্ন স্তরে প্রচেষ্টায় দ্বিধা-দুর্বলতা দেখা গেছে; বিভিন্ন চরিত্রে ক্রিয়ায় অথবা প্রতিক্রিয়ায় অল্প-বিস্তর তারতম্য আছে। কিন্তু কোথাও এমন কোনও কথা বা কাজ দেখা যায় নি যা থেকে মনে হতে পারে দুই বিরুদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব-নিরসনের সম্ভাবনা বা পন্থা বিদ্যমান। এই প্রকার আপোষহীন শ্রেণী-সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিপ্লব,—যে বিপ্লব কোনও একজনের দ্বারা সংঘটিত হয় না; নন্দিনীর প্রকাশ্য প্রেরণায় ও রঞ্জনের অদৃশ্য পরিচালনায়, এবং কিশোর-বিশু-ফাগুলালের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যার ফলসিদ্ধি। সংস্কারমুক্ত মনে নাটকের তত্ত্ব অনুশীলন করলে এর ভাবে কিংবা ভাষায় কিংবা ক্রমোৎঘাটিত ঘটনাপরম্পরায় এই তাৎপর্যকে ভুল বোঝবার উপায় নেই।

শ্রেণী-সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে সমাজে শোষণবৃত্তির অবসান ঘটানো, যাতে 'সর্বসাধারণ' মানুষের দল তাদের মেহনতে অর্জিত ফসলের অধিকারী হয়। নন্দিনী ও রঞ্জনের

মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে যক্ষপুরীর কারিগরেরা এই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়; এর পশ্চাতে একটা প্রস্তুতিপর্ব আছে, যার অস্তিত্ব সন্দেহ করে সর্দারেরা নন্দিনীকে সংযত করতে চেষ্টা করেছে, রঞ্জনের পথরোধ করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এবং উভয়ের মধ্যে যাতে মিলন না ঘটে তার জন্য কোনও আয়োজন করতে কসুর করেনি। তারা রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিয়োজিত করেছে তাদের শোষণবৃত্তিকে অব্যাহত রাখবার জন্য। রাষ্ট্রের এই 'মানুষছাঁকা' প্রতাপের ভয়ঙ্কর রূপ আমাদের নানাদিক থেকে দেখানো হয়েছে। 'সে বিপুল শক্তি অনায়াসে' সেই 'মরা ধন' নিয়ে দিনরাত নাড়াচাড়া করে; তার 'প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো'—দেখে "মানুষের মন আশ্চর্য মানে। কিন্তু ক্রমশঃ এই বিরাট শক্তির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল; রাষ্ট্রব্যবস্থার পাকা ভিতে ফাটল ধরলো, যা অধ্যাপক-পুরাণবাগীশের আলোচনায় প্রকট হয়েছে :

পুরাণবাগীশ

ভিতরে এ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো—ভয়ংকর শব্দ যে।

অধ্যাপক

রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরি একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ

মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হুড়্‌মুড়্‌ করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক

আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হ'ত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাৎ হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্ খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চীড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব একদিনের আকস্মিক ঘটনা নয়; দীর্ঘদিন ধরে মূলধন সঞ্চয়ের ফলে রাষ্ট্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ নাটকের 'প্রস্তাবনায়' বলেছেন, "আমাদের স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনিই আপনাকে পরাস্ত করে।" তার শক্তির ব্যবহার নানাবিধ মানবিক ও অর্থনৈতিক কারণে যে দুর্বলতা প্রকাশ করে তারই সুযোগে বিরুদ্ধশক্তি প্রবলতর হয়ে ওঠে এবং চরম আঘাত হানবার ক্ষমতা অর্জন করে।

রাজার এই অবস্থায় রাজ-বৈদ্যকে ডেকে আনা হলো, এবং তিনি এর যা প্রতিকার বাতলালেন, তাতে কবির অভীপ্সা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। তিনি বললেন, এর প্রতিকার "বড়ো রকমের ধাক্কা, হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাঁধিয়ে তোলা।" রাষ্ট্রবিপ্লবকে প্রতিরোধ করতে সাম্রাজ্যবাদীদের এ নীতি ইতিহাসের পাতায় পাতায় সমর্থিত। দুটো মহাযুদ্ধের কারণ এরই মধ্যে নিহিত। এই কারণে ইংরাজেরা এতটা যত্ন করে ভারতে হিন্দু-মসলেম বিরোধ পরিপোষণ করেছিল; আজও বেলজিয়্যানরা কঙ্গোতে 'এই খেলা জুগিয়ে দিয়ে নিজের খেলনা ভাঙছে।' রুশ-বিপ্লবের পরে কি অদম্য অধ্যবসায় সহকারে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রচক্র প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করেছে—যাতে কোনও রকমে সম্রাটের মৃত্যুর পরেও সাম্রাজ্যবাদী পেষণ-ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে। সঙ্কট-মুহূর্তে প্রতি-সঙ্কট সৃষ্টি করা, বিপ্লবের মুখে প্রতি-বিপ্লবের আয়োজন করা—এতে দ্বান্দ্বিক নিয়মে সমাজের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ থাকে।

অবশ্য সর্দারেরা এই প্রকার পরিণতি আশঙ্কা করে পূর্ব থেকে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা করেছে: "লক্ষণ দেখে আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি।" জনগণ রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করতে বদ্ধপরিকর,—এ অবস্থায় সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য একমাত্র ভরসা: সৈন্যশক্তি দিয়ে গণশক্তির প্রতিরোধ। কিন্তু যেহেতু আখেরে একতটা সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে কোনও

নিশ্চয়তা নেই, সর্দারের মন আফশোষে ভরে গেল। এত ধন-দৌলতের সমারোহ—তার কি-না এই পরিণতি ! "হায় হায়, কী দুঃখ ! আমাদের স্বর্ণপুরী যে রকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল এমন কোনোদিন হয়নি, ঠিক সেই সময়টাতেই—!" প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে না পেরে রক্ষণশীলদের চিরকালের এই হা-হুতাশ—যা আজও বন্ কিংবা টাইপে থেকে শোনা যায়।

জনগণকে উত্তেজিত করছে মুক্ত-চেতনা—নন্দিনী যার দিশারী, রক্তকরবী যার রক্ত-পতাকা। জালের আড়ালে সংগুপ্ত রাজ-শক্তিকে জানবার, তার আবরণ খুলে ফেলবার চেষ্টায় নাটকটি আবদ্ধ হয়েছিল। "সরকারের বাঁধন" নন্দিনীকে বাঁধতে চেষ্টা করেছে, পারেনি। সে যক্ষপুরীর "আচমকা আলো"; "ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে"— "ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।" অর্থাৎ নন্দিনী রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতার অবসান চায় না ; চায় শুধু তাকে আলোয় আনন্দে রূপান্তর করতে ; সে রাষ্ট্র-শাসনের অবসান চায় না, চায় শুধু তার মানবীকরণ,—যাতে সে মানবিক প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হয়। তার উদ্দীপনায় কায়েমী ব্যবস্থার সমর্থক অধ্যাপক পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে : "আমরা নিরেট নিরাকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি। তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।" অধ্যাপক কিন্তু তার প্রাক্-বৈপ্লবিক ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয় না। সে নন্দিনীকে প্রলুব্ধ করে : "এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।" কিন্তু প্রতিবাদের ঝংকার নন্দিনীর ভাষায় মন্দ্রিত হয় : "না না, এখন না— আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব ;" "আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।" সে জানে রাষ্ট্রশক্তি তখনই মঙ্গলময় হয় যখন সে "আলোতে বেরিয়ে আসে, মাটির উপর পা দেয়।" নির্বস্তুক মানবতা-বর্জিত শোষণ-

কার্যে লিপ্ত নির্মম রাষ্ট্রশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা আঘাত করেছেন টলস্টয়-গান্ধীর মতো তিনি নৈরাজ্যবাদী স্বপ্নে কখনও বিভ্রান্ত হননি; আবার কমিউনিষ্টদের মতো তিনি রাষ্ট্রের অবসান কখনও কল্পনা করেননি। তিনি চেয়েছেন রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তান্তর, শ্রেণীদ্বন্দ্বের মাধ্যমে নিপীড়িত জনগণের জয়। যক্ষপুরীর শুষ্ক অনুর্বর মরুভূমি একদিন উর্বর হবে, খুশীতে ভরে উঠবে, "ঝড়ের হাওয়া" বইবে তার উপর দিয়ে,—এই আশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে নন্দিনী বলছে, "আমি তোমাকে বলছি, রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন।" কবির কল্পনায় এইভাবে মুক্তমনের নির্ভীক অভিযান রাষ্ট্রশক্তিকে তলায় তলায় দুর্বল করে দেয়; তার উদ্দেশ্যে মানবিক আদর্শ ফাটল ধরায়; তার ভিৎ কেঁপে ওঠে। এই অঘটনে বিস্ময়ে আনন্দে উৎফুল্ল জনগণের মধ্য থেকে শোনা যায়,"তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে?" এখন তারা যক্ষপুরীর দুর্গ থেকে মুক্তি চায়, এবং তা "কবুল করতেও ভয় করে না"। তাদের এই নির্ভীকতা তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিসঞ্চয়ের পরিচয়। রাজা "জুজুর পুতুল" এটা তাদের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নন্দিনী রাজাকে বলে, "এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছো তারা ভয় করতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি আসে, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরতো, তবু ভয় পেতো না"।

জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতা যতই বাড়তে থাকে, সর্দারদের অত্যাচার ততই সীমা ছাড়িয়ে যায়। নন্দিনীর ভূমিকাও সেইসঙ্গে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, "আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।" এই বজ্রইত আসুরিক শক্তি সংহারের দধীচির আত্মোৎসর্গ—নাটকে রঞ্জন যার প্রতীক। তাই এই আসন্ন সঙ্কট মুহূর্তে তার আগমনবার্তা দিকে দিকে ঘোষিত হচ্ছে। গজ্জু পালোয়ান অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মহা আতঙ্কে মুমূর্ষু: বিশুর হাতে হাতকড়ি পড়েছে, তাকে "পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে।"

কিশোর চলেছে বিপদের মুখে রঞ্জনকে অভ্যর্থনা জানাতে,—নন্দিনী "তার মনে যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে।"

"দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল।" গোঁসাই একবার শেষ চেষ্টা করল নন্দিনীকে 'নাম দিয়ে ভোলাতে'। কিন্তু নন্দিনী যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে: "শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে!" কারণ এর-ওর মুখে, বিশু-কিশোরের আনন্দোচ্ছ্বাসে, সর্দারদের আতঙ্কে, বিভিন্ন চরিত্রের আলাপে-আচরণে খবর ছড়িয়ে পড়ছে রঞ্জন এসেছে। কেউ দেখেছে তাকে কোনও পল্লীতে, কেউ তার কথা শুনে ভয়ে আঁৎকে উঠে বলছে, "চুপ চুপ",—"আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি।" এই প্রলয়ঙ্কর আবেষ্টনের সময় এল নন্দিনী ও রাজার মধ্যে চরম বোঝা-পড়ার পালা।

(২)

রাষ্ট্র নৈর্ব্যক্তিক নয়, যদিও সে শ্রেণীস্বার্থে একটা নির্বস্তুক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তার ক্ষমতা হস্তগত করতে হলে তার উপস্বত্ব-ভোগীদের পরাস্ত করতে হবে বঞ্চিত সর্বহারাদের সাহায্যে। তার জন্য চাই জনগণের বিপ্লব-অভিযান ও রাষ্ট্র-শক্তিবাহকদের সক্রিয় সহযোগিতা। রাষ্ট্রশক্তির ধারক ও বাহক পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, রবীন্দ্রনাথ যদি বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশ-সৈন্যবাহিনীদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ দেখাতেন, সেটা অনেক বেশী বাস্তবানুগ ও স্পষ্ট হত। কিন্তু যক্ষপুরীর জীবনের যে সামগ্রিক চিত্র তাঁর মানসপটে তিনি দেখেছেন, তাকে কল্পনার তুলি দিয়ে তিনি এঁকেছেন। শেলী যখন 'প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড'-এ 'ডিমোগর্গন'-এর আক্রমণে 'জুপিটার'-এর মহাপতন কল্পনা করেছিলেন, তার

আকস্মিকতা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তার সর্বজনসম্মত মীমাংসা আজও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' রচনা করেন রুশ বিপ্লবের সাত বৎসর পরে। সেখানে জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রকাশ-মুহূর্তে লেনিনের সহসা আবির্ভাব ও নেতৃত্বগ্রহণের ফলে ঘটনার বেগ ত্বরান্বিত হল এবং রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের হস্তগত হল। শেলী 'প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড' লিখেছিলেন যে বিপ্লবের পটভূমিকায়, তার ব্যর্থতা সারা ইউরোপকে প্রতিক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তা ছাড়া শেলী লিখেছিলেন যে সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তা ছিল নিতান্তই কল্পনা-বিলাস। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের বৈপ্লবিক রূপ দেখেছিলেন; এর ফলে তাঁর চেতনায় গণবিপ্লবের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল, তা ঐতিহাসিক কারণে শেলীর অপেক্ষা আরও অনেক স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, আরও বাস্তবানুগ হতে পারত নিশ্চয়। কিন্তু যতটা তিনি অবধারণা করেছিলেন আমাদের দেশের পরিবেশের মধ্যে, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

রঞ্জন এসেছে এই আভাস পেয়ে নন্দিনী ধাক্কা দিল রাজার দুয়ারে। সে শুনল রাজশক্তির হুকুম জারি হয়েছে রঞ্জনকে এনে দিতে, নন্দিনীকে দরজার মুখ থেকে চলে যেতে হবে। এই শেষ সংগ্রামের মুখে নন্দিনী কি করবে এ প্রশ্নের চেয়ে অনেক বেশী জরুরী,—রাজা কি করতে পারে? রাজা ধ্বজাপূজা—অর্থাৎ জাতীয়বাদের পূজা দ্বারা তার দ্রুত অপসৃয়মান ক্ষমতাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করে। অবশ্য ক্ষমতার আস্ফালনে নন্দিনীকে সে আর ভয় দেখাতে পারল না, কারণ মানুষের জাগ্রত চেতনা চরম বিপদের মুহূর্তে নির্ভীক—তাইতেই তার মনুষ্যত্ব। কিন্তু রাজশক্তির পূর্ণ বিকাশ সে দেখল,—এবং তাকে দেখল রঞ্জনের মৃত্যুর পটভূমিকায়। সেই মৃত্যুর মাঝে রঞ্জন অমরত্ব লাভ করল; দুঃখের মাঝে নন্দিনী তাকে অভিনন্দিত করল, "বীর আমার,... তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে, সেই যাত্রার বাহন আমি।" রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপটে রঞ্জনের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে,

কিশোর "বুদ্‌বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।" চরম মুহূর্তের আর দেরী নেই।

"নন্দিনী

রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা

কিসের সময়

নন্দিনী

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী

তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।"

মানুষ যখন মৃত্যু পণ করে অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয় তখন তাকে রুখ্‌তে পারে এমন শক্তি কোনও রাষ্ট্রের নেই। তখনই রাষ্ট্র-ক্ষমতা এক অবক্ষয়িত শ্রেণীর হাত থেকে নবশক্তিতে পরিপুষ্ট বিরুদ্ধ শ্রেণীর করায়ত্ত হয়। এই রূপান্তরের বাহন মানুষের মুক্ত-চেতনা। তাই রাজা নন্দিনীকে বলছে, "আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেতে হবে আমারই হাতে হাত রেখে।" এই পরিবর্তনের চিহ্ন হিসাবে রাজা তার ধ্বজদণ্ড—তার পূর্ব ভূমিকার পতাকা—ভেঙে ফেলে দিয়ে বললে,—"আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি"—অর্থাৎ মুক্ত মানবচেতনার আঘাতে রাজশক্তি একশ্রেণীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, গণরাষ্ট্রে পরিণত হল—এই সাঙ্কেতিক অর্থ সন্দেহাতীত।

এর পর শুরু হল সর্দারদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান। উন্মত্ত বিদ্রোহী কারিগরের দল এগিয়ে এল সর্দারশক্তিকে পরাজিত

করতে। নন্দিনীর মুখে তারা শুনল মৃত্যুর মধ্যে রঞ্জনের অপরাজিত কণ্ঠস্বর। কারিগরদের শক্তিতে পরিপুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রশক্তি চলল বন্দীশালা ভাঙতে। নাটকের অবসান হল নন্দিনীর জয়ধ্বনিতে, মুক্ত মানুষের অপরাজেয় মনের বিজয়-ঘোষণায়; আর দূর থেকে সর্বসাফল্যের গান ভেসে এলো—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।

এ গান আকর্ষণজীবীদের গান নয়; এ তাদেরই আনন্দগান যাদের মেহনতে ধরণীর ডালা পাকা ফসলে ভরে যায়, যাদের বাঁশি শুনে আকাশ খুসী হয়। তখন রুদ্ধ ঘরে বদ্ধ হয়ে পঙ্গুজীবন যাপন করবে কে? মুক্তির দুয়ার খুলে গিয়েছে; মানুষের শক্তি উন্মুক্ত আকাশের তলায় অবারিত; সারা পৃথিবীর রূপ বদলে গিয়েছে;—প্রকৃতির কবি, মানুষের কবি, এ সৌন্দর্যে অবগাহন করে গেয়ে ওঠেন—

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিক্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায় হায় হায়।

'আকর্ষণীজীবী' সভ্যতার পরাজয়ের পর তার বিপরীত ধর্মা 'কর্ষণীজীবী' সভ্যতার বিজয়-সঙ্গীতে নাটকের শেষ হল।

———

নবম পরিচ্ছেদ

রচনা-রীতি ও তার উদ্দেশ্য

আলোচনার উপসংহারে নাটকের রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমি বলেছি নাটকটির আঙ্গিকে গ্রীক নাটকের গঠন-সংহতি ও আমাদের লোকনাট্যের অনিয়ন্ত্রিত গতি চাঞ্চল্যের সার্থক সংমিশ্রণ ঘটেছে। শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক বা রচনা-রীতি সৃষ্টির প্রয়োজনেই উদ্ভাবিত হয়। প্রয়োজনের অভিনবত্ব আঙ্গিকে নূতন পদ্ধতি আমদানি করে। 'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল একটি যুগের পরিব্যাপ্তি নাট্য-সীমার মধ্যে প্রকাশ করা; সে যুগকে আমরা ধনতান্ত্রিক যুগ বলে থাকি। অপর দিকে সে যুগের বিপ্লবাত্মক অবসানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে নাটকের দ্রুত সমাপ্তি ঘটেছে। একদিকে কালের প্রসারিত ব্যাপ্তির পটভূমিকায় মনে হয় জীবনের গতিচাঞ্চল্য অবরুদ্ধ, অথবা অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতার মধ্যে আবর্তিত। অন্যদিকে ঘনায়মান সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখি, একটা অভাবনীয় সমাপ্তির আসন্নতা ঘটনার গতিবেগকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে যাকে স্থির অচঞ্চল মনে হয়, আসন্ন সমাপ্তির সম্ভাবনায় তাকেই মনে হয় চঞ্চল, বেগবান। বিরতি ও গতির এই আপেক্ষিক তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র এবং ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন:

"এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি—মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে স্থিরত্বের কাঠামোতে দাঁড় করাই, নইলে দেখা বলে জানা বলে পদার্থটা থাকতই না। অর্থাৎ চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা মিথ্যার

মায়া। আবার আর এককালের পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি।...কিন্তু সরল বুদ্ধি জানে চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ যেটা নিকটবর্তী সেটা চলছে। সমগ্র যেটা দূরবর্তী সেটা স্থির রয়েছে।" [সঞ্চয় : আমার ধর্ম, ১৯১৬]

অর্থাৎ ব্যাষ্টিজ্ঞানে যাকে উপলব্ধি করি তা চিরচঞ্চল; আবার সমষ্টিজ্ঞানে যাকে অবধারণা করি, তা অচঞ্চল। শিল্পীর সমস্যা হল অচঞ্চলতার পরিপ্রেক্ষণিকায় চঞ্চলতার ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট রেখায় প্রকাশ করা। একদিন আমাদের লোকশিল্পে এই ধারণা কল্পিত হয়েছিল প্রচলিত কালী মূর্তিতে। সেখানে মহাকাল স্তব্ধ হয়ে অনন্তশয়ানে চির অবস্থিত; তার উপর ক্ষণকাল মুহূর্তকে সংহার করতে করতে চলেছে 'দুরন্ত উল্লাসে'। 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে অনুরূপ শিল্প-সমস্যা রবীন্দ্রনাথের মানসপটে উদয় হয়েছিল। এই নাটকে কোনও ব্যক্তি-মানুষের জীবনসঙ্কট নয়, মানব-সমাজের যুগসঙ্কটই আসল বিষয়-বস্তু। ব্যক্তি-মানুষের জীবনে সঙ্কটের আবির্ভাব হলে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরের গতি দ্রুততর ছন্দে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। এই দ্রুতবেগ আমরা শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু যাকে যুগসঙ্কট বলি, তা সুদীর্ঘ প্রস্তুতির পর একটা আকস্মিক পরিণতিতে সমাপ্ত হয়। প্রস্তুতি পথের গতি কিছুটা শ্লথ, কিন্তু পরিণতির বেগ অত্যন্ত দ্রুত। এই সমস্যার নাট্যিক প্রকরণে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

রঙ্গমঞ্চে একটা জটিল জালের অন্তরালে আবদ্ধ রাজা যুগপরিব্যাপ্ত রাষ্ট্রসত্তার প্রতীক। এর অপরিবর্তিত অবস্থান দর্শকের মনে একটা কেন্দ্রস্থিতির চেতনা জাগিয়ে রাখে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় এই প্রতীকের পটভূমিকায় বাস্তব মানুষের 'আসা যাওয়ার আভাস' পরিবেশকে চঞ্চল করেছে। এখানে গ্রীক নাটকের স্থান-কাল-সমন্বিত ঐক্যবিধির একটা নিপুণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। 'রাজা'র দিকে চেয়ে দেখি—মনে হয় যেন কালের বিবর্তন ঐ জালের আড়ালে

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। শুধু যবনিকার অন্তরালে একটা চাপা বিরামহীন ঘর্ঘরানি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে বিবর্তনের অতন্দ্র ক্রিয়াশীলতা থেমে যায়নি—সে যেন 'রুদ্ধ আবেগে আসন্ন ঝটিকা'র অপেক্ষা করছে। আর এই বিরামহীন বিবর্তনধারা সদাচঞ্চল ব্যক্তি-মানুষের কর্মব্যস্ত দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ জীবনের পর্দায় প্রক্ষিপ্ত হয়ে তাকে রং-বেরংএ বিচিত্রিত করছে—যা সাহিত্যের চিরন্তন সামগ্রী।

কালপ্রবাহের এই স্তম্ভিত প্রতীকের সামনে বাস্তব জীবনের গতিপ্রবাহ বিভিন্ন ধারায় ছুটে চলেছে—এর রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ যে আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন তার সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে নাটকের সর্বার্থসিদ্ধ ব্যঞ্জনায়। চোখের সামনে দেখি ব্যক্তি-মানুষের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না, রোষ-আফশোষের সচঞ্চল প্রকাশ। লৌকিক যাত্রা-নাটকের মত, এর আখ্যানভাগে কোনও জটিলতা নেই; এর উপাদান-বিন্যাস কোনও ঔৎসুক্য বা কৌতূহল জাগায় না। তাই এখানে আধুনিক নাট্যমঞ্চের পটবেষ্টনীর প্রয়োজন নেই, কারণ দর্শক ও অভিনেতা, বা জীবন ও জীবনালেখ্যর মধ্যে কোনও প্রকার কৃত্রিম ব্যবধান নাটকের তাৎপর্য-ধারণার পক্ষে অর্থহীন। এখানে জীবনকে ছকে বেঁধে অঙ্ক-গর্ভাঙ্কে ভাগ করে প্রদর্শন করবারও প্রয়োজন নেই, কারণ জীবনের প্রবাহধর্মিতাই এর মূল উপাদান। গ্রীক্ নাটক একটি অভিজাত সমাজের সার্থক অভিব্যক্তি। তাই সেখানে বিশিষ্ট রূপ-সজ্জায় নাট্যচরিত্রগুলি এক উচ্চ স্তরে প্রদর্শিত হয়। সেখানে জীবনের প্রবাহের চেয়ে তার কালানুগত প্রকাশই নাট্যকারের লক্ষ্য। এই রীতি সামান্য পরিবর্তিত আকারে পরবর্তী কালের পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে। যে সমাজের ঝোঁক স্থিতিশীলতার দিকে, সেখানে এ রীতির সার্থকতা নিশ্চয় আছে। কিন্তু গণজাগরণের যুগে, জীবন যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রভাবে সহস্র ধারায় বিচ্ছুরিত, সেখানে এ রীতির অপর্যাপ্ততা সুস্পষ্ট। এই কারণে বিংশ শতাব্দীতে নাট্য-প্রকরণ নিয়ে পরীক্ষার অন্ত নেই। আধুনিক

যুগের প্রয়োজনের দিক থেকে শেক্‌স্‌পীরীয় নাট্যরীতির সার্থকতা শেষ হয়েছে, এই উপলব্ধির সঙ্গে নানা বিভিন্ন ধরণের নাট্যরীতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। কিছুটা রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্যরীতির সংমিশ্রণে অভিব্যঞ্জক (expressionist) রীতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই নাট্য-প্রকরণে কেন্দ্র-চরিত্রের মধ্যে একটা নৈতিক বা সামাজিক দ্বন্দ্ব নিয়ত মানসিক সঙ্কট সৃষ্টি করছে, এবং দুনিয়াকে দেখানো হয় এই সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষণায়। সাধারণ নাট্যরীতিতে এর সার্থক রূপায়ণ কোনও মতেই সম্ভব নয়, কারণ তার উদ্দেশ্য জীবনকে ছকে ফেলে খণ্ডিত আকারে দেখানো। কিন্তু এই শ্রেণীর অভিব্যঞ্জনাত্মক নাটকে ব্যক্তি-কেন্দ্রের চতুর্দিকে বিঘূর্ণমান জগৎকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় যে নাট্যজগৎ সৃষ্টি হয়, অনেক সময়ে তা মনে হয় যেন পাগলের প্রলাপ, যেন বিচ্ছিন্ন এলোমেলো দুঃস্বপ্ন : তাতে কোনও প্রকার শিল্পিক সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নিয়ে আসা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার মীমাংসা করেছেন সাঙ্কেতিক ও অভিব্যঞ্জনাত্মক নাটকের সঙ্গে সাধারণ নাট্য-রীতির সংমিশ্রণ করে, যাতে ব্যক্তি-জীবনের বিচ্ছিন্ন সমস্যা সমাজ-জীবনের প্রবাহধর্মিতাকে ক্ষুণ্ণ না করে ; যাতে কোনও নায়কের ব্যক্তি-সমস্যা সমষ্টি জীবনের সমস্যাকে প্রচ্ছন্ন না করে। অতএব পাশ্চাত্য সাহিত্যে গত অর্ধশতাব্দী ধরে যে সমস্ত নাট্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা চলেছে, রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত ও অনুসৃত নাট্যরীতি একান্তভাবে তারই উন্নত সংস্করণ।

পূর্বেই বলেছি শেক্‌স্‌পীরীয় রীতি-অনুগামী প্রচলিত নাট্য-প্রকরণ তার সীমিত প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই নাটকের উদ্দেশ্য জীবনপ্রবাহের একটি তরঙ্গের তুঙ্গ মুহূর্তকে রঙ্গমঞ্চের পটবেষ্টনীর মধ্যে স্থায়িত্ব দেওয়া। এই মুহূর্তগুলি পৃথক দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয়। তাদের আবেদন ক্ষেত্র বিশেষ মর্মান্তিক (tragedy) অথবা নর্মাত্মক (comedy)। গ্রীক আলঙ্কারিক নাট্য রচনায় এদের সংমিশ্রণকে নাট্য-শিল্পের সংকর্ষ বলে

যথাসম্ভব পরিহার করতে উপদেশ দিয়েছেন। যদিও শেক্‌স্‌পীয়র অথবা তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারেরা এ নির্দেশ গ্রাহ্য করেননি, মোটামুটিভাবে বলা যায়, অধিকাংশ সমালোচক এর সার্থকতা শিল্পের দিক থেকে স্বীকার করেছেন। কারণ, ব্যক্তিপ্রধান নাটকে শিল্পের চরম উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করবার জন্য দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে সমষ্টিগতভাবে দেখতে গেলে কোনও ঘটনা নর্মাত্মক বা মর্মান্তক হতে পারে না। তাই আধুনিক নাটকে জীবনের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টায় এ জাতীয় নাটকীয় জাতিভেদ অনাবশ্যক বলে পরিহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে-রীতি অবলম্বন করেছেন, তাতে এ জাতীয় প্রশ্নের স্থান নেই। কালপ্রবাহের অন্তর্গত ব্যক্তিজীবনের উত্থান-পতনের কাহিনীতে বিশ্লিষ্ট ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া নায়ক-কেন্দ্রিক নাটকের উপাদান হতে পারে, কিন্তু গণ-জীবনের আলেখ্য হিসাবে তার অসার্থকতা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত নাট্যরীতি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে সমর্থিত। কবি 'রক্তকরবী'তে দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সমাজে দুইটি বিপরীত শ্রেণীর মধ্যে এক আপোষহীন সংগ্রাম দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধিত হচ্ছে। এক পক্ষের কেন্দ্রপুরুষ 'রাজা,' অপরপক্ষে 'রঞ্জন'। এই দুইটি নায়ক-স্থানীয় চরিত্রের নেপথ্যে অবস্থান সাধারণ মানুষগুলিকে সামনে আনবার সুযোগ দিয়েছে। এরা প্রত্যেকে ব্যক্তি-গুণে বিশিষ্ট অথচ সকলেই নিজেদের শ্রেণীর প্রতিনিধি। এর ফলে ব্যক্তি-দ্বন্দ্বের জায়গায় শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়েছে। জালের আড়ালে রাজার নিষ্ফল আক্রোশ ও উৎক্ষেপ তার শ্রেণীগত ব্যর্থতার পরিচয় ঘোষণা করছে। অপরপক্ষে রঞ্জনের অবিশ্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টার পরিব্যাপ্ত ইসারা বিরুদ্ধ-শ্রেণীর ক্রম-বর্ধমান শক্তি-সঞ্চয়ের সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে। এই শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে কবি নানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন কিভাবে সাধারণ মানুষের মন ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়।

একদিকে সর্দারের দুরভিসন্ধিমূলক কূটনীতি তাকে চরম সঙ্কটের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে ফাগুলালের ঘনায়মান ক্রোধ তার শ্রেণী-চেতনার বাস্তবতা প্রকাশ করছে। মাঝখানে আছে মোড়ো-সর্দারের মানবিক দ্বিধা; গোকুল-চন্দ্রার ভয়-ভ্রান্তি। এই মধ্যবর্তী চরিত্র-গুলি উভয় শ্রেণীর অগ্রগামিতার পরিমাণ নির্ধারণের মাপকাঠি। শ্রেণীচেতনার এই পরিমাণগত পরিবর্তন একটা মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের দিকে কিভাবে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে তা নাটকের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। প্রযোজনায় দেখা যাবে সর্দারদের ক্ষয়িষ্ণুতা কারিগরদের শক্তি-সংগ্রহকে বিপ্লবমুখী করে তুলছে।

এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য কখনই এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্ববাদের সূত্র ধরে তাঁর নাটক রচনা করেছেন। যে কাব্যকার অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে কাব্য রচনা করেন, তিনি আর যাই হন, কবি নন। অলঙ্কার প্রয়োগে কাব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা পূর্ণতা লাভ করে; এই জন্যই কবিরা অলঙ্কার ব্যবহার করেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথের নাটকের অর্থ যদি বস্তুবাদের বিচারে আরও পূর্ণ হয়, আরও স্পষ্ট হয়, তার মানে এই বিচার নির্ভুল ও সার্থক। অপ্রয়োগে হয়ত ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রয়োগের সার্থকতা জাজ্বল্যমান।

উপসংহার

সঙ্কেতের নির্দেশ

রাজা অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি, যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না : জটিল জালের আড়ালে সকলের অগোচরে কাজ করে অথচ সকলেই তার শক্তির দাপটে তটস্থ। নাটকের প্রারম্ভে সর্দারদের শ্রেণী স্বার্থে নিষ্পেষণী যন্ত্র ; অবসানে মুক্ত মানুষের করায়ত্ত হয়ে সর্দারের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানে উদ্যত

নন্দিনী : মানবিক আত্মচেতনা,—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজেয়, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার।" এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সাহিত্যে ও শিল্পে,—জীর্ণ সংস্কারের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করে ; ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থায় নূতন আদর্শের চেতনা জাগিয়ে দিয়ে মানুষকে নিত্য নূতন চলার পথে এগিয়ে দেয়।

সর্দার : 'আকর্ষণজীবী' অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ। এদের মধ্যে ছোট সর্দার সবচেয়ে হিংস্র ও নির্লজ্জ ; মেজো সর্দার মানবিক চেতনার উন্মেষের ফলে কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত। সর্দারদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ তাদের সঙ্কটের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, যাতে তাদের অবসান সূচিত।

রঞ্জন : আদর্শবাদী নির্ভীক বিপ্লবী নেতা, যে তলায় তলায় প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিকে আঘাত করে জীর্ণ করে দেয়, নন্দিনীর শক্তি-বিকাশের ক্ষেত্র প্রসারিত করে দেয়। নন্দিনীর সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করে, কারণ মননশক্তি ও কর্মশক্তির মিলিত চেষ্টায় আদর্শ বাস্তবে পরিণত হতে পারে। রঞ্জনকে দেখা যায় নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্তে : তারই মৃতদেহের উপর দিয়ে বিপ্লবের জয়যাত্রা সুরু হয়।

কিশোর, বিশু, ফাগুলাল, গজ্জু : 'কর্ষণ'জীবী অর্থাৎ শোষিত মানুষের প্রতিনিধি। এরা বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজ-সচেতন শ্রমিক।

গোকুল, চন্দ্রা : এরাও 'কর্ষণ'জীবী সমাজের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সনাতন-পন্থী, সংস্কারবাদী ভীরু মানুষ। সর্দারদের স্তোকবাক্যে ভুলে থাকে।

অধ্যাপক : বুদ্ধিজীবী তত্ত্ববিলাসী, যার পাণ্ডিত্য জ্ঞানকৈবল্যের নামান্তর। কিন্তু তার যুক্তি-সচেতন মন সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে সর্বাগ্রে ধারণা করতে সক্ষম। প্রাচীনের সমর্থক কিন্তু নবযুগের আভাস পেয়ে উচ্চকিত।

পুরাণবাগীশ : প্রাচীন ব্যবস্থাকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করে।

গোঁসাই : ধার্মিকতার মুখোস পরে সর্দারদের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। তার প্রচারিত ধর্মবুলি জনগণের পক্ষে আফিম সদৃশ।

যক্ষপুরী : ধনতান্ত্রিক দেশ। এখানে সাধারণ মানুষের পক্ষে আকাশে আলো নেই, মনে আশা নেই; আছে শুধু মেহনতের অধিকার। উপর তলার মানুষের জীবনে আছে টাকার নেশা, ক্ষমতার দম্ভ আর কৃত্রিম আনন্দের উন্মাদনা।

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" : ফসল কাটার গান; নতুন সমাজের আগমনী সঙ্গীত।

(ক) গ্রন্থ নির্দেশিকা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী, তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : রবিরশ্মি, পশ্চিম ভাগ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : সাহিত্য প্রবাহ : রক্তকরবী।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস।

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস।

ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাট্যবিচার, দ্বিতীয় খণ্ড।

" " " : রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা।

ডক্টর সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : কবিগুরুর রক্তকরবী।

শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী।

(খ) প্রবন্ধ নির্দেশিকা

রক্তকরবীর তিনজন : অন্নদাশঙ্কর রায় (বিচিত্রা, ১৩৩৪ ভাদ্র)

শিশিরকুমার মৈত্র : রক্তকরবী (উত্তরা, ১৩৩৫, অগ্রহায়ণ)

লীলা রায় : রক্তকরবী (জয়ন্তী উৎসর্গ, ১৩৩৮)

শম্ভু মিত্র : রক্তকরবী (বহুরূপী, তৃতীয় সংখ্যা)

উৎপল দত্ত : বহুরূপী ও রক্তকরবী (পাদপ্রদীপ, ১৮৭৯ চৈত্র)

বিষয় নির্দেশিকা